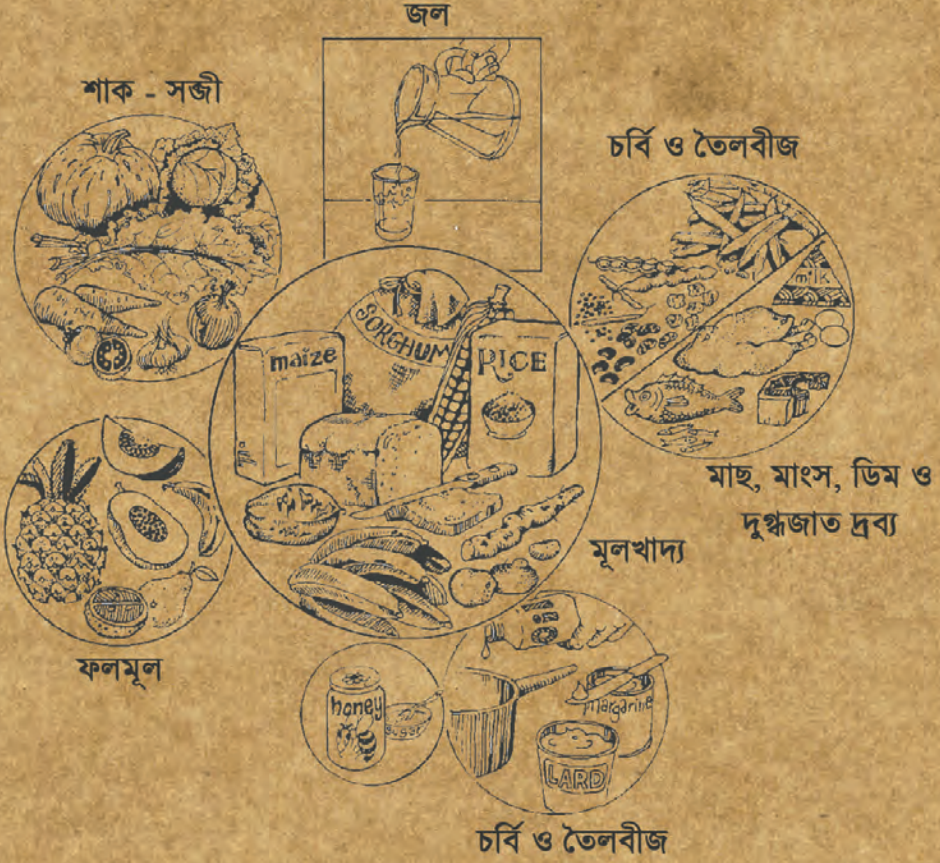


প্রাথমিক স্তরে পুষ্টিশিক্ষা



প্রাথমিক স্তরে
পুষ্টিশিক্ষা

প্রাথমিক স্তরে পুষ্টিশিক্ষা
Prathomik Stare Pusti-sikkha

প্রকাশকঃ

AHEAD Initiatives

৫/১/২/জি কর্নফিল্ড রোড (বালিগঞ্জ)

কলিকাতা - ৭০০ ০১৯

ফোন- ০৩৩ ৪০৬৭ ০৩৬৯

ইমেল- ahead@aheadinitiatives.in

প্রচ্ছদঃ অদ্রীশ

প্রকাশ কাল - ২০১৫

মুদ্রণ-ব্যয় বাবদ প্রার্থিত অনুদান: ৩০/-

ভূমিকা

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জনজীবনের মানোন্নয়নে বিভিন্নরকম পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিস্তারিতভাবে বলা যায় যে কৃষি, বিপণন, শিল্প, পরিবেশ, দেশের পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে উন্নয়নের কথা ভাবা হলেও পুষ্টি নিয়ে উন্নয়নমূলক ভাবনা চিন্তা একেবারেই করা হয়নি। অথচ যে কোনও দেশের উন্নয়ন নির্ভর করে থাকে সেই দেশের জনজীবনের পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উপর — স্কুল ভিত্তিক পুষ্টি-শিক্ষা এই তিনটি উপাদানকে ঘিরে থাকে। দেশের অগ্রগতিতে স্বাস্থ্যের ভূমিকা আমরা জানি। অ-সুস্থ জনস্বাস্থ্য নিয়ে একটা দেশ বা রাষ্ট্র কখনোই এগোতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে সু-স্বাস্থ্য নির্ভর করে সু-খাদ্যের উপর। মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন হচ্ছে খাদ্য এবং কী খাচ্ছি আর কতটা খাচ্ছি, খাবারের পুষ্টিগত গুণ ও নিরাপত্তা আমাদের স্বাস্থ্যকে সরাসরি প্রভাবিত করে।

উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা যে অত্যন্ত জরুরি সে তো আমাদের সবার জানা আছে। শিক্ষা দেয় ভালো-মন্দ বোঝার জ্ঞান এবং নিজের ও সবার উপকারে লাগবে এমন কাজ করার বোধ। আর শিক্ষার সঙ্গে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য একে অপরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্ত।

তাই বলা যায় যে সুস্থ না থাকলে যেমন সু-শিক্ষা লাভ করা যায় না তেমনি সু-শিক্ষার অভাবে স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একইভাবে পুষ্টির সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক রয়েছে। পুষ্টিযুক্ত খাদ্য শিশুর স্বাস্থ্যকে সুগঠিত করে এবং তার মানসিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। সু-স্বাস্থ্য ও পুষ্টি যুক্ত খাবার শিশুর মনোযোগ বাড়ায়, শেখার ক্ষমতা বাড়ায় ও পড়ালেখার সঙ্গে যুক্ত সবারকমের কাজের প্রতি ইচ্ছা বাড়ায়। সমীক্ষায় দেখা গেছে সু-স্বাস্থ্য ও পুষ্টিকর খাদ্যের মানের সঙ্গে শিশুর স্কুলে ভর্তি, উপস্থিতি ও শিশুকে স্কুলে ধরে রাখার একটা সম্পর্ক আছে।

এই সমস্ত কিছু ভেবেই 'প্রাথমিক স্তরে পুষ্টিশিক্ষা' সম্পর্কিত এই পুস্তিকাটি বাংলা ভাষায় প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে এই পুস্তিকাটি রাষ্ট্রপুঞ্জ দ্বারা প্রকাশিত Nutrition Education in Primary Schools - এর অনুবাদ। কোনরকম নতুন তথ্য ও পরিসংখ্যান সংযোজন ছাড়াই পুস্তিকাটির অংশ বিশেষ অনুবাদ প্রকাশ করা হলো।

সূচীপত্র

১) পুষ্টিশিক্ষা কেন এত জরুরি?	১
উন্নয়নশীল দেশের জন্য পুষ্টিশিক্ষার কেন এত প্রয়োজন?	১
স্কুলের মাধ্যমে পুষ্টিশিক্ষা	২
স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাস তৈরি করার ক্ষেত্রে স্কুল	৩
স্কুলে কার্যকরী পুষ্টিশিক্ষার জন্য প্রয়োজন একটি বিস্তৃত পাঠক্রম	৪
২) পরিকল্পনা নির্দেশিকা	৮
এই নির্দেশিকাটির উদ্দেশ্য	৯
নির্দেশিকাটির রূপরেখা ও উপকরণ	১০
পরিকল্পনা নির্দেশিকাটি কিভাবে স্থানীয় স্তরে ব্যবহার করা যাবে	১২
৩) পথ্য কাকে বলে?	১৪
সু-পথ্য	১৫
ক) আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন হয় কেন?	১৬
খ) পুষ্টিকর খাদ্য ও তাদের বিভিন্ন কাজ	১৭
গ) আমাদের খাদ্য সামগ্রীর উৎস	১৮
ঘ) প্রয়োজনীয় পথ্য	১৯
১) বৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তা	১৯
সুস্থ থাকতে ও বেড়ে উঠতে আমাদের প্রয়োজন	২০
২) বিভিন্ন ধরনের মানুষের পথ্যের চাহিদাও ভিন্নঃ	২০
ব্যক্তিগত চাহিদা	২০
৩) স্কুলে যাওয়া শিশুদের খাবারের চাহিদা কেমন ?	২২
স্কুলে যাওয়া বাচ্চাদের কেন সু-খাদ্যের প্রয়োজন হয়	২২
স্কুলে যাওয়া বাচ্চাদের শক্তি চাহিদা (কিলো ক্যালোরি)	২২
স্কুলে যাওয়া শিশুদের পথ্যের চাহিদা কিভাবে মেটানো হবে	২৩
স্কুলে যাওয়া বাচ্চাদের জন্য উপযুক্ত জলখাবার	২৪
যেসব জলখাবারের কোনও গুণ নেই	২৪
স্কুলে যাওয়া শিশুদের জন্য ভালো ও মন্দ খাবার	২৪
স্কুলে যাওয়া শিশুদের জন্য সুপারিশ করা খাদ্য পরিমাণ	২৫
৬) কিভাবে আমরা মিশ্র ও সুস্বাদু পথ্য তৈরি করব	২৬
১. পথ্য সংক্রান্ত নির্দেশিক	২৬
২) স্থানীয়/আঞ্চলিক পথ্য	২৭

মনে রাখা জরুরি	২৮
স্বাস্থ্যকর পথ্য মোটেও জটিল ও দামী নয়	২৯
চ) নিয়মিতভাবে খাদ্য সরবরাহ	২৯
ছ) উপসংহার	২৯
প্রধান পুষ্টি উপাদান, তাদের কাজ ও উৎস	৩০
অপুষ্টি ও তার কারণঃ	৩১
কার্যবিধি ১ : নাম-তালিকা	৩৩
অপুষ্টি বলতে আমরা যে সব শব্দ ব্যবহার করি	৩৩
কয়েক ধরনের অপুষ্টিজনিত সমস্যা	৩৪
কার্যবিধি ২ : অপুষ্টির প্রভাব	৩৪
কার্যবিধি ৩ : লক্ষণ চিহ্নিত করা	৩৫
বাচ্চাটা কী সত্যিই অমনোযোগী না কি অপুষ্টিতে ভুগছে?	৩৫
বিপদ সঙ্কেত সম্বন্ধে শিক্ষকদের সংবেদনশীল হওয়া উচিত	৩৬
কার্যবিধি ৪ : অপুষ্টির কারণ	৩৭
পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা	৩৮
স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার - পরিচ্ছন্নতা	৪০
পুষ্টি নিরাপত্তা - পরিবারের সু-পুষ্টির চাবিকাঠি	৪১
অপুষ্টির অনেক কারণ	৪২
১। গোষ্ঠীগত ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ	৪২
পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তাঃ	৪২
স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	৪২
জ্ঞান ও যত্ন	৪৩
২। শিক্ষা ও স্কুলের ভূমিকা	৪৩
শিক্ষার ভূমিকা	৪৩
উপসংহারঃ যা জানলাম	৪৪

পুষ্টি শিক্ষা কেন এত জরুরি?



সক্রিয় সমাজ জীবনের লক্ষ্যে পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে এই উপাদানগুলির দিকে নজর দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। যে সব উপায় বা ব্যবস্থার ফলে দেশের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুষ্টির উন্নতি ঘটে, দেখা গেছে, সেই সব উপায়গুলির প্রভাবে দেশে সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ঘটে। পুষ্টি শিক্ষা হলো তেমনই একটি উপায়। এই শিক্ষার সাহায্যে আমরা জানতে পারি কী খেলে এবং দৈনন্দিন জীবনে কোন কোন অভ্যাস তৈরি করলে আমরা সুস্থ ও সক্রিয় থাকব। অপুষ্টিজনিত সমস্যার

দুটি প্রধান কারণঃ

- (১) গুণগত ও নিরাপদ খাদ্যের অভাব
- (২) অতিমাত্রায় খাদ্যগ্রহণ বা কোনও বিশেষ ধরনের খাদ্য গ্রহণ।

এই দুটোই রোধ করা সম্ভব হয় যথাযথ খাদ্যাভ্যাসের সাহায্যে। খাবার সরবরাহের পরিমাণ কম বেশি যাই হোক না কেন, কীভাবে আমরা নিরাপদ ও সু-খাদ্য জোগাড় করতে পারি তার উপায়গুলি আমাদের জানা দরকার। গৃহস্থেরা যাতে খাদ্য নিরাপত্তা ও পরিমাণ মতো পুষ্টিকর খাবার খেতে পারে তার জন্য তাদের প্রয়োজন খাদ্য তৈরি ও সংগ্রহ করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা। পারিবারিক সুস্বাস্থ্যের জন্য উপযুক্ত খাদ্যাভাস কী, এবং কী উপায়ে এই অভ্যাস তৈরি করা যায় তা জানা প্রয়োজন।

গরীব পরিবারের ক্ষেত্রে এই পুষ্টি শিক্ষা অত্যন্ত জরুরি। এর সাহায্যে তারা তাদের স্থানীয় খাবারগুলি কীভাবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করতে পারবে ও কীভাবে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার অভ্যাস তৈরি করতে পারবে সেই বিষয়ে জানতে পারে। তাছাড়া খাদ্যাভাসজনিত যেসব অ-সংক্রামক রোগ সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলির সঙ্গে কীভাবে মোকাবিলা করা যায় তাও জানা যাবে।

উন্নয়নশীল দেশের জন্য পুষ্টি শিক্ষার কেন এত প্রয়োজন?

আপাতভাবে মনে হতে পারে যে, উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সমস্যার তুলনায় পুষ্টিজনিত সমস্যার গুরুত্ব কম। কিন্তু আদতে পুষ্টি শিক্ষার গুরুত্ব এইসব দেশে অত্যন্ত বেশি। তার কারণগুলি হলোঃ

- ✓ অতিমাত্রায় পুষ্টি-হীনতা ও পুষ্টির অভাবের (ভিটামিন এ, আয়োডিন, আয়রন-এর অভাব, রক্তাল্পতার প্রকোপ) কারণে তৎপরতার সঙ্গে কাজ করার প্রয়োজন হয়।
- ✓ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে খাদ্য-সংক্রান্ত নানান দীর্ঘস্থায়ী অসুখ বেড়ে যাচ্ছে। অতিরিক্ত ওজন, মোটা হয়ে যাওয়ার সমস্যা বেড়ে চলেছে। অপুষ্টি ও খাদ্যাভাসে স্থিতিশীলতার অভাবে যেসব রোগ দেখা দিচ্ছে সেগুলিকে মোকাবিলা করার সমস্যা দেখা দিচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে।
- ✓ অর্থনৈতিক ও মানব উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সুস্থ মানুষ।
- ✓ উচ্চহারে জনসংখ্যার বৃদ্ধি দেশের খাদ্য ব্যবস্থায় প্রভাব ফেলে। ফলে খাদ্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে মানুষের সচেতন হওয়া দরকার এবং খাদ্য ব্যবস্থায় নতুন পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে শেখা দরকার।
- ✓ গ্রাম ছেড়ে শহরে পাড়ি দেওয়ার মাত্রা বেড়েছে। আর শহরের মানুষকে খাবার কিনে খেতে হয়। ফলে শহরে আসা দেশান্তরী মানুষদের পুষ্টিকর খাদ্য জোগাড় করতে দক্ষতার প্রয়োজন হয়।
- ✓ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিশ্বায়নের ফলে আমাদের খাদ্যাভাসে ও জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এসেছে। নতুন নতুন খাবারের কথা আমরা জেনেছি ও সেগুলি খাওয়ার সুযোগ এসেছে। এর ফলে আমাদের চিরকালীন জ্ঞান-গম্বি, ধ্যান-ধারণা ও দক্ষতা আর কাজে লাগেনা, অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এখন পুষ্টির প্রয়োজন মেটাতে ও সুস্থ খাদ্যাভ্যাস তৈরি করতে নতুন জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি চিরকালীন ঐতিহ্যশালী জ্ঞান ও দক্ষতাকেও আমরা যেন অবহেলা না করি।

স্কুলের মাধ্যমে পুষ্টিশিক্ষা



পুষ্টিশিক্ষার সবচেয়ে ভালো জায়গা হলো স্কুল। স্কুলে এসেই শিশুদের জীবনশৈলী গড়ে ওঠে। শিশুরা তাদের পরিবেশের নানান মানুষের সঙ্গে আদান প্রদানের মাধ্যমে আচরণ বা ব্যবহার শেখে। বাবা-মা,

আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক শিক্ষিকা, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তাদের আদান-প্রদান চলে। বাড়ির পরিবেশ, পরিবার, পাড়া, গণমাধ্যম- যেমন টিভি, রেডিও ও স্কুলের পরিবেশ তাদের উপর প্রভাব ফেলে। শিশুদের খাদ্যাভ্যাস ও আচার-আচরণে স্কুলের প্রভাব প্রচুর।

স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস তৈরি করার ক্ষেত্রে স্কুল হলো আদর্শ জায়গা



- ✓ বেশ কিছু বছর ধরে স্কুলের সঙ্গে বেশ কিছু সংখ্যক শিশুর নিয়মিত যোগাযোগ থাকে।
- ✓ ছোট শিশুদেরকে ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার পথ দেখানোর দায়িত্ব নেয় স্কুল। এক স্বাস্থ্যকর পরিপূর্ণ জীবন লাভ করার পিছনে থাকে পুষ্টিযুক্ত খাদ্য। ফলে পুষ্টি শিক্ষা সম্বন্ধে ধারণা তৈরি করার দায়িত্ব বর্তায় স্কুলের উপর।
- ✓ শেখানো, পথ দেখানোর জন্য উপযুক্ত কর্মী রয়েছে।
- ✓ শিশুর যে বয়স থেকে খাদ্যাভ্যাস তৈরি হয় ও শিশুরা আচার-আচরণ ও ব্যবহার করতে শেখে, তখনই স্কুল এদের দায়িত্ব নেয়।
- ✓ স্কুলে খাদ্য সংক্রান্ত কর্মসূচিগুলিতে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্য নিরাপত্তা শেখানোর সুযোগ থাকে।
- ✓ নানান স্বাস্থ্যবিধি যেমন হাত ধোয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পুষ্টি সংক্রান্ত নানান অভ্যাস চর্চা করা সম্ভব হয় ও স্কুলের কর্মপ্রণালীতে সেগুলি অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়।
- ✓ শিশুদের পুষ্টিশিক্ষা বিষয়টিতে তাদের পরিবারকেও যুক্ত করা সম্ভব হয় ফলে এইভাবে পুষ্টি শিক্ষা ছড়িয়ে যেতে পারে।
- ✓ গোষ্ঠী বা কমিউনিটির অংশগ্রহণমূলক কাজগুলিতে স্কুল একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। স্কুলে বাগান করার কর্মসূচি বা স্কুলে ক্যানটিন চালু করে বা নানান ধরনের কমিটি তৈরি করে কমিউনিটির মানুষদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা সম্ভব হয়।
- ✓ স্কুল ন্যায্য মূল্যে পুষ্টিকর খাদ্য জোগানের ব্যবস্থা করতে পারে (শিক্ষা দান ছাড়াও)।

প্রাথমিক স্কুলগুলি পুষ্টিশিক্ষার উপযুক্ত মাধ্যম। যে বয়স থেকে শিশুদের মধ্যে অভ্যাস তৈরি হয় সেই বয়সী শিশুরাই প্রাথমিক স্কুলে আসে। তাছাড়া প্রাথমিক স্কুলের মাধ্যমে পুষ্টিশিক্ষা বহু সংখ্যক শিশুর কাছে পৌঁছে যায়, বিশেষ করে মেয়েদের কাছে। আর এটা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো, কারণ আমাদের দেশে মেয়েরা অনেক আগেই স্কুল ছুট হয়। পুষ্টি শিক্ষার ক্ষেত্রে, সাধারণভাবে উদাহরণসহ রঙচঙে ছবি খুব আকর্ষণীয় হয়। হাতে কলমে শেখানোর মাধ্যমে পুষ্টি শিক্ষা দেওয়া সম্ভব।

স্কুলে কার্যকরী পুষ্টিশিক্ষার জন্য প্রয়োজন একটি বিস্তৃত পাঠক্রম যার ভিত্তি হবে স্বাস্থ্য উন্নয়ন নীতি



প্রচারমূলক পদ্ধতিতে পুষ্টিশিক্ষা দেওয়ার প্রকৃষ্ট স্থান হলো স্কুল। স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে স্কুল-ভিত্তিক কাজকর্মকে ক্লাস ঘরে আটকে না রেখে, স্কুলের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সুস্বাস্থ্যবিধির প্রচার করে, তখন সেগুলো পুষ্টিশিক্ষার বিস্তৃত পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। শ্রেণীকক্ষের বাইরে, যে কোনও পুষ্টি ও খাদ্য সংক্রান্ত কর্মসূচি, স্কুল নীতি ও স্কুলের নিয়মাবলী হলো পুষ্টি বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরাসরি ও অবশ্যম্ভাবী উপায়। স্বাস্থ্য উন্নতির কর্মসূচির সঙ্গে পুষ্টি শিক্ষা যুক্ত হলে স্বাস্থ্যকর পুষ্টির লক্ষ্য সাধিত হয় এবং এর সঙ্গে যারা জড়িত থাকে তারা গোটা বিষয়টি সম্বন্ধ অবহিত হতে পারে ও অংশ নিতে পারে। একেই বলা হয়, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া/কার্যক্রম। এইভাবে স্কুল পরিবেশ পুষ্টি শিক্ষার উৎস হয়ে ওঠে ও শ্রেণীকক্ষ ভিত্তিক পাঠক্রমের পরিপূরক হয়ে ওঠে। যেমন ধরুন, খাবার আগে হাত ধোওয়া একটি অতি পুরাতন সু-অভ্যাস। কিন্তু এই হাত ধোওয়ার কথা যখন শিশু তার ক্লাসে গিয়ে শোনে, তখন হাত ধোওয়া নিয়ে স্কুলের নিয়ম তৈরি হয়। এরপর সেই নিয়ে যখন ক্লাসে আলোচনা হয় এবং স্কুলে হাত ধোওয়ার জন্য সাবান জোগান ও হাত ধোওয়ার পদ্ধতি যখন শেখানো হয়; তারপর স্কুলের বাইরে অন্যান্য জায়গায় হাত ধোওয়ার ব্যবস্থা নিয়ে খোঁজ খবর নেওয়া হয় এবং বাড়ি ফিরে বাচ্চার যখন বাবা-মায়ের সঙ্গে হাত ধোওয়ার কারণ নিয়ে আলোচনা করে, তখন হাত ধোওয়ার মতো বিষয়টি পুষ্টিশিক্ষার পাঠক্রমে ঢুকে পড়ে।

এই বিস্তৃত পাঠক্রমে পরিবার ও কমিউনিটি হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পুষ্টি শিক্ষার ব্যাপারে স্কুলের যেমন একটি ভূমিকা আছে, তেমনই পরিবার ও কমিউনিটিরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। প্রাথমিকভাবে



খাদ্য সংক্রান্ত অভ্যাস তৈরি হয় ও চর্চিত হয় পরিবারে। পরিবার ছাড়িয়ে পাড়া, পড়শি, কমিউনিটিতে গিয়ে পরিবারের চৌহদ্দিতে শেখা অভ্যাসগুলি শক্তপোক্ত হয়ে ওঠে। প্রচার মাধ্যমগুলি ও শিশুর চারপাশের পরিবেশ শিশুর খাদ্যাভ্যাসকে প্রভাবিত করে। খাওয়া-দাওয়া বাদে স্কুল পাঠক্রমের অন্য কোনও বিষয় পরিবেশ থেকে শিখে ফেলার এত সুযোগ নেই। ফলে স্কুল ভিত্তিক পুষ্টিশিক্ষা যেন এই অন্যান্য মাধ্যমগুলির সঙ্গে একযোগে কাজ করে।

অতএব, পুষ্টিশিক্ষার ব্যাপারে স্কুলকে পরিবারের সঙ্গে আদান-প্রদানে যেতে হবে, পরিবারের সাহায্য নিতে হবে। স্কুলকে বুঝতে হবে শেখানো, পড়ানো ছাড়াও পাঠসংক্রান্ত খোঁজখবর, তত্ত্ব-তালাশও স্কুলকে করতে হবে। পরিবার ও সমাজের নানান সংগঠন, ব্যক্তি ও সরকারী বিভাগ, যারা খাদ্য ও পুষ্টি নিয়ে কাজ করে, তাদের সঙ্গে স্কুলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

খাদ্য ও খাদ্যাভাস নির্ভর করে আমাদের স্থানীয় পরিবেশ পরিস্থিতির উপর যেমন – স্থানীয় কৃষি ব্যবস্থা, স্থানীয় রান্নার প্রণালী, স্থানীয় অর্থনীতি ও বিশ্বাস ভাবধারা। পুষ্টি শিক্ষার একটি সাধারণ জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত্তি থাকলেও স্থানীয় সম্পদ, সমস্যা ও সমাধান, প্রয়োজন ও চাহিদা পুষ্টিশিক্ষার পাঠক্রমে বৈচিত্র্য যোগ করে। ফলে এলাকা অনুসারে পাঠক্রমে ভিন্নতা তৈরি হয়।

ফলে এলাকার ভৌত ও সামাজিক পরিবেশ – কোথায় ও কীভাবে খাদ্যসামগ্রী ফলানো হচ্ছে, কীভাবে সেগুলি প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে, রান্না হচ্ছে, বিক্রি হচ্ছে, কিভাবে খাওয়া হচ্ছে ও উচ্ছিষ্ট ফেলে দেওয়া হচ্ছে – এই সবকিছুই জীবন্ত পাঠ্যপুস্তক হয়ে ওঠে। ফলে স্কুল যেমন পুষ্টিশিক্ষা সংক্রান্ত ছেপে বেরোনো পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করবে, তেমনই পরিবেশ থেকে উঠে আসা জীবন্ত পাঠ্যপুস্তকগুলিও ব্যবহার করবে।

এইভাবে বিস্তৃত পাঠক্রমের উপাদানগুলি, যেমন স্কুল পরিবেশে শেখা বিষয়গুলি, পরিবার ও কমিউনিটিতে শেখা অভ্যাসগুলি এবং এর বাইরের পরিবেশ থেকে নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শেখা বিষয়গুলি সব মিলে মিশে গিয়ে শ্রেণীকক্ষে শেখা পুষ্টিশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হবে ও স্কুল ভিত্তিক পুষ্টিশিক্ষার অঙ্গ হয়ে উঠবে।

স্কুল-ভিত্তিক একটি কার্যকরী পুষ্টিশিক্ষার প্রয়োজন হলো স্বাস্থ্য উন্নীতকরণ উপায় ও একটি ত্রিপাক্ষিক পাঠ্যক্রম



শ্রেণীকক্ষে যে শিক্ষা দেওয়া হবে তার ভিত্তি হবে এই বিশ্বাস, যে স্বাস্থ্যশিক্ষার মতো পুষ্টি শিক্ষাও আচার আচরণ ব্যবহার ও বোঝাপড়া নির্ভর।

স্কুলে শেখা অন্যান্য বিষয়ের চাইতে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিশিক্ষার বিষয়টি শিখে নিতে একজন পড়ুয়াকে অনেক বেশি নিজে নিজে কাজ করতে হয়। শিশুকে যেমন অনেক বেশি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা, দেখা, পরীক্ষা করতে, আলোচনা করতে হবে ও অন্যদের কাছ থেকেও এই বিষয়ে শুনতে হবে এবং এসবের উপরে শিশুদেরকে তাদের লব্ধ অভিজ্ঞতাকে উপলব্ধি করতে হবে। সেই সঙ্গে নিজের পছন্দ-অপছন্দ, ভালো-মন্দ নিজেকে বেছে নিতে হবে। ফলে স্বাস্থ্য উন্নয়ন সম্পর্কিত ধারণাগুলি ও পুষ্টি সংক্রান্ত শিক্ষাগুলি শিখতে গেলে আগেই আমাদের নির্দিষ্ট করে নিতে হবে : আমরা কী শিখব, কীভাবে শিখব ও কোথায় শিখব। এর অর্থ স্কুলে পুষ্টিশিক্ষা দান করতে হলে স্কুলকে এর উপযোগী হয়ে উঠতে হবে। তার জন্য কয়েকটি উপায় অবলম্বন করতে হবেঃ

- ✓ পরিবার ও কমিউনিটির সঙ্গে সু-সম্পর্ক তৈরি করা
- ✓ স্থানীয় পরিবেশ ও খাদ্যাভাসের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠা
- ✓ স্থানীয় পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে শ্রেণীকক্ষের উপাদানগুলি গড়ে তোলা
- ✓ নিজের এলাকা ঘুরে দেখা, নানান কর্মসূচী নেওয়া ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা
- ✓ স্কুল নীতি তৈরি করা
- ✓ শ্রেণীকক্ষের পদ্ধতি ও উপাদানগুলিকে পুষ্টিশিক্ষার উপযোগী করে ফেলা

শিক্ষা দপ্তর ও শিক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে পুষ্টিশিক্ষা পাঠ্যক্রমের পরিবর্ধন করার অর্থ হলো বিভিন্ন বিভাগ ও স্তর জুড়ে নানা ধরনের কাজ করা যেমনঃ

- ✓ উপযুক্ত পাঠ্যক্রম তৈরি করা
- ✓ শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ
- ✓ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদান তৈরি করা
- ✓ স্কুলকে নানাভাবে সাহায্য করা

সাধারণভাবে স্কুল পাঠক্রমগুলি পরীক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা ভারাক্রান্ত থাকে। পাঠক্রমে পুষ্টি শিক্ষার কোনও জায়গাই থাকে না। আর থাকলেও পুষ্টিশিক্ষা, গৃহ অর্থনীতি সিলেবাসের অংশ হিসাবে থাকে। দেখা যাচ্ছে পুষ্টিশিক্ষার নিজস্ব একটি জায়গা থাকা দরকার। স্বাস্থ্যকর সমাজের ভিত্তি হলো স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস। এই স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস তৈরি করতে হলে স্কুল ভিত্তিক পুষ্টিশিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম।

উপসংহার

এই নির্দেশিকাতে যেভাবে বলা হয়েছে সেইভাবে যদি পুষ্টিশিক্ষা দেওয়া যায় তাহলে শিশুরা খুব তাড়াতাড়ি এবং স্বল্প সময়েই পুষ্টিসংক্রান্ত বিষয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। এই বিষয়ে শিক্ষিত হলে শিশুরা বুঝতে পারবে কী উপায়ে সীমিত রসদ থাকা সত্ত্বেও সু-খাদ্য জোগাড় করা সম্ভব হয়, কোন কোন খাবার পুষ্টিগুণ সম্পন্ন, কোথায় সেগুলি পাওয়া যায়, কীভাবে নিরাপদে খাবার রান্না করা যায়, কীভাবে খাওয়া-দাওয়ায় রুচি আনা সম্ভব এবং কীভাবে খাদ্য-সংক্রান্ত বিপদ এড়ানো সম্ভব হবে।

এক কথায় কিভাবে ভালো খাবার প্রস্তুত করা সম্ভব এবং কিভাবে আমরা নিজেদের জন্য ও অন্যদের জন্য (বৃদ্ধ ও অসুস্থ মানুষ) সু-খাদ্যাভ্যাস তৈরি করতে পারব, সুস্থ জীবন শৈলী বেছে নিতে শিখব – সেগুলি আমাদের জানতে হবে। কৃষিভিত্তিক পরিবেশের শিশুরা জানবে চাষাবাদ সম্পর্কিত নানা নতুন ও পুরানো উপায়, কী চাষ করা হয়, কীভাবে করা হয়, কীভাবে ফসল ঘরে তোলা হয় ও তা সংরক্ষণ করা হয়। শহরে বাস করা শিশুরা জানবে – কোন দোকান থেকে কোন খাদ্য কেনা যায়, কোন দোকান-বাজারগুলি স্বাস্থ্যকর নয় এবং কী উপায়ে বিজ্ঞাপনের প্রলোভন এড়িয়ে তাদের সঠিক খাদ্য সামগ্রী বেছে নিতে হবে।

এছাড়াও পরিশ্রুত ও নিরাপদ জল পান করা ও কাচা-ধোয়ার কাজে জল ব্যবহার করার গুরুত্ব সম্বন্ধে সবাই অবহিত থাকতে পারবে।

এছাড়াও বড় হয়ে যখন তারা নিজেরাই বাবা-মা হবে তখন গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের পুষ্টিগত সমস্যা সম্বন্ধে ধারণা তৈরি হয়ে থাকবে। তাদের স্তন-দান ও পরিপূরক খাদ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে ধারণা থাকবে এবং নিজেদের সন্তান-সন্ততির জন্য সু-খাদ্যাভ্যাস ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে পারবে। পুষ্টিশিক্ষায় শিক্ষিত প্রাপ্তবয়স্করা জানবেন কোন সূত্র থেকে খাদ্য সামগ্রী, খাদ্যাভ্যাস সংক্রান্ত খবরাখবর পাওয়া যায়। তাঁরা খাদ্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে অবহিত থাকবেন এবং কী উপায়ে এই খাদ্য পদ্ধতিতে বৈচিত্র আনা যায় তাও তাঁরা জানবেন। খাবার সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণাগুলিকে তাঁরা প্রতিরোধ করবেন ও খাদ্য সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় নীতিগুলিকে বোঝার মতো সক্ষমতা অর্জন করবেন। এছাড়াও এই বিষয় নিয়ে তাঁরা তর্ক-বিতর্কে অংশ নেবেন ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত হবেন।

একটি সমাজের দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়নে পুষ্টিশিক্ষার যে কতটা ভূমিকা থাকে তা আমরা দেখতেই পাচ্ছি।

পরিকল্পনা নির্দেশিকা

নির্দেশিকাটি কী?

ক্ষুধা ও দারিদ্র থেকে মুক্তি শিক্ষার প্রচলন একটি উঠতে পারে। আর এই FAO'র খাদ্য ও পুষ্টি বিভাগ বৃত্তিমূলক সংস্থাগুলির কৌশল ও উপাদান তৈরি লাগিয়ে স্কুল-ভিত্তিক পুষ্টি রূপায়ণ করা সম্ভব। এই এই রকম একটা



পেতে প্রাথমিক স্কুলে পুষ্টি অন্যতম হাতিয়ার হয়ে ব্যাপারে সাহায্য করতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও সাহায্য নিয়ে কিছু উপায়-করেছে, যেগুলিকে কাজে শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরি ও পরিকল্পনা নির্দেশিকাটি উদ্যোগ।

এটি পুষ্টি সংক্রান্ত কোনও প্রশিক্ষণ পর্ব নয়। বরং এটির সাহায্যে যে কোনও দেশ পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষাগত খেয়াল/নজর রাখতে পারবে। এই নির্দেশিকাটির সাহায্যে স্কুলগুলিতে কার্যকরী পুষ্টিশিক্ষা কর্মসূচী চালু করা সম্ভব হবে। যে কোনও প্রথাগত “পুষ্টিশিক্ষা” থেকে এই নির্দেশিকাটির পঠন পাঠনে ফারাক আছে। এই নির্দেশিকাটির কয়েকটি বিশেষত্বের কারণে এর ভিত্তিতে তৈরি করা পাঠক্রম আলাদা মূল্য পেয়ে যায়।

বৈশিষ্ট্যগুলি হলোঃ

- ✓ ত্রিপাক্ষিক পাঠক্রমঃ এই নির্দেশিকাটি তৈরি হয়েছে স্বাস্থ্য উন্নতির সম্যক ধারণার উপর ভিত্তি করে। তাছাড়াও এই নির্দেশিকাটি বিশ্বাস করে যে, একটি শিশু শুধুমাত্র শ্রেণীকক্ষেই খেতে শেখে না। তার খাদ্যাভ্যাস তৈরি হয় ঘরে, কমিউনিটিতে ও বাইরের পরিবেশে। ফলে শ্রেণীকক্ষে শেখা পুষ্টি সংক্রান্ত শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ও উন্নত করার ক্ষেত্রে পরিবার ও কমিউনিটির সঙ্গে আলাপ আলোচনা ও স্কুলের পরিবেশকে পুষ্টি শিক্ষার অনুকূলে গড়ে তোলা প্রয়োজন।
- ✓ শেখাকে অনেক বড় করে দেখাঃ পুষ্টি শিক্ষাকে আরো বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে চাওয়ার অর্থ হলো পুষ্টিশিক্ষাকে সু-খাদ্যাভাসে তৈরি করা। এই শিক্ষার সাহায্যে জ্ঞান আহরণ, ব্যবহার ও জীবনধারায় পরিবর্তন আসে। এছাড়াও কী শিখছি তার সাথে তাল মিলিয়ে শিক্ষণ পদ্ধতি তৈরি করা হয়।
- ✓ সর্বাঙ্গীণতাঃ শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াও সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন কৃষি, স্বাস্থ্য, জন-পরিষেবা মূলক ক্ষেত্রগুলির সহায়তা, দায়বদ্ধতা ও দক্ষতা যে শিশুদের পুষ্টি ও পুষ্টিশিক্ষাকে প্রভাবিত করে সেই সম্যক ধারণাতে এই নির্দেশিকাটি বিশ্বাস রাখে। ফলে পুষ্টিশিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনায় ওই

ক্ষেত্রগুলির ভূমিকা একদম শুরুতেই থাকা দরকার। এই নির্দেশিকাটি সেটাই মনে করে।

✓ স্থানীয় পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর গুরুত্ব দানঃ এই নির্দেশিকাটি স্থানীয় খাদ্য চাহিদা, এবং কী কী খাবার স্থানীয় এলাকাগত ভাবে পাওয়া যায়, তার উপর যেমন গুরুত্ব দেয়, তেমনি স্থানীয় খাদ্যাভ্যাসকে প্রাধান্য দেয় ও তা নিয়ে চর্চা করে।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য এই নির্দেশিকাটি যে কোনও প্রথাগত পুষ্টিশিক্ষার তুলনায় অনেক বেশি কার্যকরী হওয়ার বিশ্বাস ও আশা রাখে। এই নির্দেশিকাটি যে কোনও স্কুল ও শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। বিশেষ করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় 'বিশ্ব স্কুল স্বাস্থ্য উদ্যোগটির সঙ্গে বেশি করে খাপ খেয়ে যায়। স্বাস্থ্য উন্নয়নে পুষ্টির ভূমিকাকে এখানে জোর দেওয়া হয়েছে এবং স্কুল-পরিবেশে স্বাস্থ্য শিক্ষণ কীভাবে খাদ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত কাজকর্মের সাহায্যে সংঘটিত হবে সেটি এখানে দেখানো হয়েছে।



এই নির্দেশিকাটির উদ্দেশ্যঃ

এই নির্দেশিকাটির সাহায্যে পুষ্টিশিক্ষা সংক্রান্ত প্রক্রিয়াগুলি পরিকল্পনা ও পরিবর্তন করা সম্ভব। তাছাড়া প্রাথমিক স্কুলে পুষ্টিশিক্ষা সংক্রান্ত পাঠক্রম তৈরি করা সম্ভব। এর লক্ষ্য হলোঃ স্কুল ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি মাত্রাতে উন্নতি আনা; চির জীবনের জন্য ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও জীবন শৈলী তৈরি করা। এই নির্দেশিকা ব্যবহার করলে যা লাভ হবেঃ

- ✓ খাদ্য সংক্রান্ত চাহিদা ও রসদের বিশ্লেষণ
- ✓ পলিসি ও শিক্ষার নীতিনির্ধারণ করা।
- ✓ শ্রেণীকক্ষে পঠন পাঠনের জন্য নতুন পাঠক্রম তৈরি করা।
- ✓ পরিবার ও কমিউনিটির অংশগ্রহণের লক্ষ্যে কৌশল বা উপায় নির্ধারণ করা।
- ✓ স্কুল পরিবেশের জন্য পরিকল্পনা করা।
- ✓ শিক্ষক/শিক্ষিকার প্রশিক্ষণের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করা।

উপরোক্ত কার্যক্রমগুলি স্থানীয় বা জাতীয় স্তরে অথবা উভয় স্তরের জন্য পরিকল্পনা করা যেতে পারে। যা প্রয়োজনে স্থানীয়, প্রদেশীয় বা জাতীয় স্তরের পরিস্থিতি ও রসদ অনুসারে উপযোগী করে নেওয়া যেতে পারে - পুষ্টিশিক্ষা কর্মসূচি পরিকল্পনা করতে গিয়ে যে কোনও ধরনের উপভোক্তা/ব্যবহারকারী যাতে এই নির্দেশিকার সাহায্য নিতে পারে সেটা মনে রেখেই এই নির্দেশিকাটি তৈরি করা হয়েছে।

নির্দেশিকাটির রূপরেখা ও উপকরণ

পাঠক্রম পরিকল্পনার বিভিন্ন স্তরের জন্য এই পরিকল্পনা নির্দেশিকার বিভিন্ন অংশ ব্যবহার করা যাবে। মূল পরিকল্পনা পর্ব আরম্ভ হওয়ার আগে প্রস্তুতি পর্ব ১ ও ২ দেখে নিতে হবে। এই পর্ব দুটিতে খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রাথমিক তথ্য গুলি দেওয়া আছে। পাঠক্রম পরিকল্পনার মূল পদ্ধতিটি নির্দেশিকাটির তিনটি অংশে দেওয়া আছে:

পর্ব ক : ধারণা ও নীতিঃ প্রাথমিক ধারণাগুলি এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পর্ব খ : পরিস্থিতি বিশ্লেষণঃ এই পর্বে পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করা হয়েছে ও কোন কোন বিষয় প্রাধান্য পাবে তা নির্দেশ করা হয়েছে।

পর্ব গ : প্রক্রিয়া পরিকল্পনাঃ স্কুল পরিবেশ ও শ্রেণীকক্ষে উপযুক্ত পরিস্থিতি তৈরি করতে কী প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হবে।

পর্ব ক -তে তিনটি বিষয় নিয়ে চর্চা করা হয়েছেঃ স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা; পাঠক্রম ও তার আনুষঙ্গিক বিষয় কমিউনিটি, স্কুল পরিবেশ, ক্লাসঘর, ক্লাসঘরে করা পঠন-পাঠন পদ্ধতি (ক্লাসঘরের রসদ)।

পর্ব খ - তে স্থান পেয়েছে কতগুলি তথ্য যা প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে জোগাড় করা হয় যেমন : শিশুর খাদ্য, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যত্ন ও চিকিৎসা, স্কুলের স্বাস্থ্য কর্মসূচি, পরিবার ও কমিউনিটির সঙ্গে স্থানের সম্পর্ক, স্কুলের পরিবেশ পরিস্থিতি, বর্তমানে ক্লাসঘরে যে পাঠক্রম পড়ানো ও শেখানো হয়, প্রচলিত শিখন পদ্ধতি। পর্ব ক ও খ এর তথ্য বিশ্লেষণগুলি।

পর্ব গ -তে একত্রিত হয়ে কার্যক্রম/ কর্মপন্থা তৈরি করে। প্রতিটি পর্বে যে সিদ্ধান্ত উঠে আসে তা নির্দেশিত হয় প্রদর্শন দলিলে। এই দলিলে প্রতিটি পর্বের অনুশীলনীগুলির একটা ছবি পাওয়া যায়।

নির্দেশিকাটি দুটি খন্ডে পাওয়া যায়। প্রথম খন্ডটি হলো পাঠ। যেখানে প্রাথমিক স্কুলে পুষ্টিশিক্ষা সংক্রান্ত সকল ধ্যান ধারণা ও পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও এতে নানান হাতেকলমে কাজের পাতা ও পুষ্টি শিক্ষা পরিকল্পনা সংক্রান্ত অনুশীলনী দেওয়া আছে। এছাড়াও রয়েছে :

প্রদর্শন দলিল : যেখানে অনুশীলনীর ফলাফল রাখা থাকে। এর সাহায্য নিয়ে পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

পাঠক্রম চার্ট : ক্লাস ঘরে কী শেখা হবে তার লক্ষ্যগুলি এই চার্টে দেওয়া থাকে।

প্রশ্নাবলী : পর্ব খ তে পরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য তথ্য জোগাড়ের উদ্দেশ্যে এই প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়। শিক্ষক, শিক্ষিকা, বাবা-মা, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ এই প্রশ্নের উত্তর দেন।

তথ্য পাতা : প্রশ্ন পত্রের উত্তর থেকে উঠে আসা তথ্য নিয়ে এই পাতা তৈরি হয়।

কর্মশালা সংগঠক ও ফেলিসিটেটরদের জন্য নির্দেশ : কীভাবে কর্মশালা আয়োজন করা হবে ও কীভাবে কর্মশালায় অনুশীলন করা হবে সেই নিয়ে নির্দেশিকা।

কারা ব্যবহার করবে : প্রাথমিক স্কুলে পুষ্টি শিক্ষার সঙ্গে জড়িত সকলেই এই নির্দেশিকা ব্যবহার করতে পারবে।

তবে প্রাথমিক ব্যবহারকারীরা হলেনঃ

- ✓ প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর ও মন্ত্রকের আধিকারিকরা
- ✓ শিক্ষা পরিদর্শক ও পরামর্শদাতা
- ✓ প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা; শিক্ষক/ শিক্ষিকা
- ✓ পুষ্টি বিশেষজ্ঞ/স্বাস্থ্য কর্মী
- ✓ শিক্ষা কাউন্সেলর
- ✓ লেখক ও শিক্ষাবিদ

ব্যবহারকারীদের দুই দলে ভাগ করা যায়ঃ

- ✓ জাতীয় স্তরে ব্যবহারকারী যারা কেন্দ্রীয় শিক্ষা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত
- ✓ স্থানীয় স্তরের ব্যবহারকারী যারা নির্দিষ্ট কোনও স্কুল বা একগুচ্ছ স্কুলের সঙ্গে যুক্ত

পরামর্শদাতা ও অন্যান্য যাঁরা এই নির্দেশিকা ব্যবহার করে পরিকল্পনা করতে সাহায্য করবেনঃ

- ✓ এন জি ও (অসরকারী উন্নয়নমূলক সংস্থা)
- ✓ সাহায্যকারী সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা
- ✓ কৃষি দপ্তর ও মন্ত্রক/স্বাস্থ্য দপ্তর ও মন্ত্রক
- ✓ স্কুলে খাদ্যের দায়িত্বে থাকা প্রকল্পগুলির আধিকারিক
- ✓ অভিভাবক-শিক্ষক প্রতিনিধি
- ✓ ইউনিয়নের প্রতিনিধি

এছাড়াও স্কুলের অন্যান্য কর্মী (শিক্ষক শিক্ষিকা বাদে), অভিভাবক, কমিউনিটির সদস্য, শিক্ষা সম্পদ কেন্দ্রের কর্মী, স্থানীয় লাইব্রেরি ও তথ্য কেন্দ্রের কর্মী, স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মীরাও এই নির্দেশিকা ও কর্মশালায় যোগদান করে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেন।

পরিকল্পনা নির্দেশিকাটি কিভাবে স্থানীয় স্তরে ব্যবহার করা যাবে

নির্দেশিকাটির লক্ষ্য প্রাসঙ্গিকতা আনা, যাতে অভ্যাস-চর্চা ও স্থানীয়ভাবে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা পরিবেশের বিষয়টিকে নির্দেশিকাটি স্থানীয় স্তরে তাছাড়া এই নির্দেশিকাটির বা পাঠক্রমের অংশকে করা যেতে পারে। এই দিনের কাজের পরিকল্পনা তৈরি হওয়া সম্ভব। এর জন্য স্কুল উদ্যোগ নিতে পারে কিম্বা স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব নিতে পারে অথবা চাকুরিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।



হলো পাঠক্রমে স্থানীয় এলাকায় পুষ্টিগত সমস্যা, যে খাদ্য তৈরি হয় সেগুলিকে যায়। কমিউনিটি ও স্থানীয় প্রাধান্য দেওয়ার ফলে প্রয়োগ করাই স্বাভাবিক। সাহায্যে পাঠক্রম তৈরি করা উন্নত করার জন্য ব্যবহার ভাবে দুই থেকে তিন

স্থানীয় স্তরে ব্যবহার করার দুটি দিক রয়েছেঃ

- ✓ যদি স্থানীয় পাঠক্রম তৈরী করতে কাজে আসে তাহলে ক্লাসরুম পাঠক্রম পরিকল্পনা করতে গিয়ে সমগ্র স্কুল পরিবেশের সঙ্গে পরিবার ও কমিউনিটিকে সংযুক্ত করতে হবে ও সেক্ষেত্রে পুষ্টি শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে পাঠক্রম তৈরিতে সমগ্র নির্দেশিকাটি ব্যবহার করতে হবে।
- ✓ যদি কোনও স্থানীয় পাঠক্রম না থাকে তবে স্কুল চত্বরে পুষ্টিশিক্ষার পঠন পাঠনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা সম্ভব।

শ্রেণীকক্ষে ব্যবহৃত স্কুল পাঠক্রমটিতে যদি সংযোজন, পরিবর্ধনের সুযোগ থাকে তবে এই নির্দেশিকাটি কাজে লাগিয়ে সেটা করা সম্ভব। যেমন ধরা যাক, স্কুলের বাইরের পরিবেশে গিয়ে কাজ করার সুযোগ রয়েছে; কমিউনিটির সঙ্গে আলাপ আলোচনায় যাওয়া যেতে পারে; স্কুলের পরিবেশকে কাজে লাগানো যেতে পারে, যেমন- স্কুলের মিড ডে মিল, স্কুলে খাবারের দোকান করা, স্কুলের বাগান ব্যবহার করা ও স্কুলে হাত-ধোওয়ার ব্যবস্থাকে পুষ্টি শিক্ষার জন্যে ব্যবহার করা। এই নির্দেশিকাটির প্রতিটি অনুশীলনী শিক্ষক শিক্ষিকাদের ব্যবহারের উপযুক্ত। এমনভাবে কর্মশালাগুলি করতে হবে যাতে পাঠের বোঝা কম হয়, নানাধরনের হাতে কলমে তৈরি কৃৎ-কৌশলগুলি অনুশীলন করা হয় যাতে কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল আমরা চোখে দেখতে পারি। বেশির ভাগ সময় হাতে কলমে কাজ করতে গিয়ে যে সব প্রশ্ন মনে আসে তাই নিয়ে যেন আলোচনা করা হয়। দেখা গেছে স্থানীয় স্তরে সামর্থ্যের অভাব রয়েছে। এই পরিকল্পনা নির্দেশিকা সামর্থ্য তৈরী করে, ফলে শিক্ষক শিক্ষিকা এটিকে যত ব্যবহার করবেন তত লাভবান হবেন। চাকুরিরত শিক্ষক প্রশিক্ষণে এই নির্দেশিকার ব্যবহার করলে পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বাড়ে, খাদ্যাভাস ঘিরে

এক সাধারণ সংস্কৃতি তৈরি হয় ও পুষ্টিকে কেন্দ্র করে একটি শিক্ষিত কর্মীদল তৈরী হয়। তবে সবচেয়ে আগে প্রয়োজন স্কুলগুলির পরিবর্তনের মানসিকতা ও সদিচ্ছা। যে সব স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা স্বল্প বেতনে কাজ করেন, যাদের কাজের চাপ বেশি এবং যাঁরা প্রতি মূহুর্তে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় পাস করাতেই ব্যস্ত, তাদেরকে পরিবর্তন ঘটাতে প্রচুর পরিমাণে পৌষ্টিক উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে কর্মশালা চালানোর জন্য ও কর্মশালা থেকে তৈরি হওয়া সিদ্ধান্ত লাগু করানোর জন্য শিক্ষা/দপ্তর/মন্ত্রককে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা স্কুলের জন্য দিতে হবে ও নানান উপায়ে স্কুলকে সহযোগিতা করতে হবে।



যেমন ধরা যাক –

- ✓ জাতীয় পুষ্টিশিক্ষার পস্থা হিসাবে এই পরিকল্পনা নির্দেশিকার নীতিগুলি ব্যবহার করা।
- ✓ কীভাবে ক্লাসের কাজ বা স্কুল পরিবেশ নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় সেই বিষয়ে স্কুল ও স্কুল কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেওয়া।
- ✓ এই উদ্যোগকে সফল করতে জাতীয় স্তরে কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ করা।
- ✓ স্থানীয় পরিদর্শক ও পরামর্শদাতারা যেন এই নির্দেশিকা অনুসারে অবস্থা/পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করেন ও তাঁদের বিশ্লেষণ থেকে উঠে আসা তথ্য যেন তাঁরা স্কুলে কীভাবে ব্যবহার হবে তাই নিয়ে আলোচনা করেন।
- ✓ স্কুল পরিবেশ ও স্কুলে খাদ্য পরিষেবা প্রদান প্রোগ্রামগুলির জন্য সাহায্য জোগাড় করা।
- ✓ অর্থ সাহায্য জোগাড় করার বিষয়ে স্কুলকে পরামর্শদান। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ কীভাবে স্কুলগুলিকে সাহায্য চেয়ে আবেদন করাতে সহযোগিতা করতে পারবে তার উপায় জানানো।

পথ্য কাকে বলে?

উদ্দেশ্যঃ

- ✓ পথ্য বলতে কী বুঝি?
- ✓ প্রধান পুষ্টিকর উপাদানগুলির উপকারিতাগুলি ফিরে দেখা।
- ✓ সাধারণ খাদ্য বস্তুগুলো কতটা পুষ্টিকর।
- ✓ আমাদের প্রয়োজন নানান ধরনের পথ্য
- ✓ ব্যক্তিগত পথ্য চাহিদাগুলি চিহ্নিত করা
- ✓ কীভাবে পথ্যের গুণমান বাড়াব

বিষয় সূচীঃ

ক) আমাদের খাবারের কেন প্রয়োজন?

খ) পুষ্টির উপাদান ও তাদের কাজ

গ) খাবারের উৎস

ঘ) পথ্যের প্রয়োজনীয়তা

- ✓ নানান ধরনের পথ্য
- ✓ বিভিন্ন দলের বিভিন্ন চাহিদা
- ✓ স্কুল বাচ্চাদের যা প্রয়োজন

ঙ) কীভাবে মিশ্র ও সুসঙ্গত পথ্য তৈরি করব

- ✓ পথ্য সংক্রান্ত নির্দেশিকা
- ✓ স্থানীয় পথ্য/খাদ্যাভ্যাস

চ) উপসংহার

যা মনে রাখবঃ

- ✓ স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন নানান ধরনের খাদ্য
- ✓ বিভিন্ন দলের ভিন্ন ধরনের পথ্যের প্রয়োজন হয়
- ✓ স্বাস্থ্যসম্মত পথ্য দামীও নয়, জটিলও নয়

সারাংশঃ

এই পর্বে আমরা সু-পথ্য কাকে বলে সেটা জানতে পারি। সু-পথ্য বলতে বুঝি খাদ্যের পরিমাণ, ধরণ বা প্রকার, পৌষ্টিক গুণাবলী, খাদ্য সুরক্ষা, খাদ্যের জোগানের মাত্রা, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা, খাদ্য নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত চাহিদা অনুসারে খাদ্য সামগ্রী উপযোগী করে তোলা। উপরোক্ত বিষয়গুলি এখানে আলোচিত হয়েছে এবং কীভাবে স্থানীয় খাদ্যাভ্যাসকে উপকারী ও উপযোগী করে তোলা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জাতীয় স্তরে পাঠক্রম যারা তৈরি করবেন তাদের জন্য বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

এই পাঠ্যপুস্তকটিকে আপনারা বিভিন্ন তথ্য ও ধারণার চেকলিস্ট হিসাবে ব্যবহার করবেন। নানান প্রকারের পথ্য ও ব্যক্তিগত পথ্য-চাহিদা ও মিশ্র খাদ্য সামগ্রী সম্বন্ধে জানতে পারবেন। পুষ্টি সম্বন্ধে যাঁরা বিশদভাবে জানতে চান, তাদের কাছে এই পুস্তকের কার্যবিধিগুলো কাজের হবে। এগুলি এককভাবে বা দলে করা সম্ভব।

সু-পথ্য

জীবনধারণের জন্য খাদ্যের বেশির ভাগ মানুষ খিদে খেতে বলে কিন্তু কী খাবো

সু-খাদ্য/পথ্য বলতে আমরা আমাদের মনে পড়ে খাবার কথা। আমাদের কাছে পুষ্টিকর কি না আর নিরাপদ অর্থ শুধুমাত্র এইটুকুই



প্রয়োজন। কিন্তু কী খাবো? পেলে খান। ক্ষুধা আমাদের তার হৃদিশ দেয় না।

কী বুঝি? সু-খাদ্য বলতে জিনিসের পরিমাণ ও গুণের সু-পথ্যের অর্থ খাবারটি কী না। কিন্তু সু-পথ্যের নয়। পুষ্টি পুরো মাত্রা লাভ

করতে গেলে সারাদিন আমাদের নানা ধরণের খাবার খেতে হবে। শুধু তাই নয় যা খাচ্ছি সেটা খেতে যেন আমাদের তৃপ্তি লাগে, আনন্দ হয়। খাবার জিনিসগুলো যেন সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়। এই তৃপ্তি ও গ্রহণযোগ্যতা বোধ আমাদের সুস্থ রাখে। এছাড়াও পরিবারের সবার জন্য যেন যথেষ্ট পরিমাণে খাবার থাকে, প্রত্যেকের ভিন্ন চাহিদার জন্য যেন যথেষ্ট খাবার থাকে। এছাড়া সারা দিন ধরে খাদ্যবস্তুর জোগানের হার ও খাদ্য নিরাপত্তা থাকাটাও জরুরি। অর্থাৎ সারাদিন ধরে আমরা যেন সঠিক পরিমাণের খাদ্য পাই। সারা বছর ধরে আমাদের যেন যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য বস্তুর সরবরাহ থাকে।

অতএব, পুষ্টিগত স্বচ্ছলতার জন্য প্রয়োজন নানা ধরণের পুষ্টিকর, নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য খাদ্য সম্ভার, যা সারা দিন ও সারা বছর ধরে পরিবারের প্রত্যেকের পথ্য-সংক্রান্ত চাহিদা পূরণ করবে। “যথেষ্ট পরিমাণে

প্রোটিন, শর্করা, ভিটামিন বা খনিজ” বা “প্রচুর পরিমাণে ফল, সবজি” বা “প্রতিদিন সকালে ভালো জলখাবার ইত্যাদি ছাড়াও আমাদের অবশ্যই আরো কয়েকটি মূল শব্দ ব্যবহার করতে হবে যেমনঃ

- ✓ পর্যাপ্ত পরিমাণে/যথেষ্ট পরিমাণে
- ✓ নানাধরনের
- ✓ পুষ্টিকর
- ✓ নিরাপদ
- ✓ তৃপ্তিকর ও গ্রহণযোগ্য
- ✓ পরিবারের সবার জন্য
- ✓ সারাদিন ধরে/সারা বছর ধরে

এর মধ্যে কয়েকটি ধারণা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। যেমন পুষ্টিকর খাদ্য কী? কেন নানা ধরনের পুষ্টিকর খাদ্য প্রয়োজন হয়? ব্যক্তি বিশেষের কেমন ধরনের বিশেষ খাবার প্রয়োজন হয়, যেমন ধরুন স্কুলে যাওয়া বাচ্চাদের কোন ধরনের খাদ্য প্রয়োজন হয়? একটি মিশ্র ও সুস্বাদু খাদ্য কিভাবে তৈরি করা যায়?

উপরোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর পাওয়া যায় একটি প্রশ্নের উত্তরে “আমাদের খাবারের প্রয়োজন হয় কেন?”

ক) আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন হয় কেন?

জীবনের জন্য খাবারের প্রয়োজন হয়। স্বাস্থ্য ও সু-পুষ্টির জন্য আমাদের প্রয়োজন পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য। পুষ্টির অভাবে ছোটদের বা অল্পবয়সীদের ক্ষমতার বিকাশ ঘটে না।

আর প্রাপ্তবয়স্করা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। এছাড়াও প্রয়োজন সঠিক পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করা। যথেষ্ট খাবার না খেলে বা বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সঠিক পরিমাণে না খেলে যেমন তাঁরা দুর্বল হয়ে পড়েন, তেমনি বেশি পরিমাণে খাবার খেলেও আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি। বেশি খাবার খেলে আমাদের শরীরে চর্বি জমতে থাকে এবং এর ফলে মোটা হয়ে যাওয়া, ডায়াবেটিস বা হার্টের অসুখ দেখা দেয়।

আমাদের শরীরে খাবারের ভূমিকা কী?

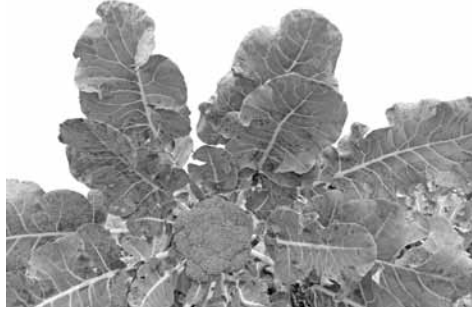
আমাদের বৃদ্ধি, নানান শারীরিক কাজকর্ম ও শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলি যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, রক্ত সঞ্চালন, হজম ইত্যাদির জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয় তার জোগান দেয় খাদ্য। এছাড়াও আমাদের শারীরিক গঠন ও রোগ থেকে সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করে খাদ্য। খাদ্যসামগ্রীতে যে পুষ্টি থাকে তার সাহায্যেই এতো কিছু কাজ হওয়া সম্ভব হয়। এই পুষ্টি উপাদান গুলি হলো : শর্করা, প্রোটিন, ফ্যাট,

ভিটামিন এ, খনিজ ইত্যাদির। এছাড়াও প্রয়োজন হয় ছিবড়া বা ফাইবার জাতীয় খাবার ও পরিশ্রুত জল। যেহেতু আমাদের প্রচুর পরিমাণে শর্করা, প্রোটিন ও স্নেহ জাতীয় খাদ্য দরকার হয় তাই এদের ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্ট বা পুষ্টি বলা হয়। ভিটামিন ও খনিজ বস্তু কম পরিমাণে লাগে বলে এদের মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট বা অতিসূক্ষ্র বলা হয়। এদের পরিমাণ খালি চোখে দেখা না গেলেও আমাদের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলি ঠিকঠাক কাজ করার জন্য প্রভাবিত করে।

খ) পুষ্টিকর খাদ্য ও তাদের বিভিন্ন কাজ

পুষ্টিকর খাদ্যের কাজ কী

চাষীরা জানেন কোন পুষ্টিকর ফলে। গাছপালা মাটি থেকে গাছপালা সার থেকেও পুষ্টি খাদ্য থেকে কিছু ধরনের সংগ্রহ করে। শিশুর জন্মকাল দিন অর্থাৎ এই পুষ্টি



খাদ্য পেলে শস্য ভালো তার পুষ্টি সংগ্রহ করে। সংগ্রহ করে। মানুষও তার এবং কিছু পরিমাণে পুষ্টি থেকে তার জীবনের শেষ সংগ্রহের কাজটি চলে।

প্রত্যেক ধরনের পুষ্টিকর খাবারের আলাদা আলাদা কাজ রয়েছেঃ

- ✓ শর্করা ও স্নেহ জাতীয় খাদ্যবস্তুগুলি শক্তির উৎস। এরা মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট। শরীরের শর্করা ও চর্বিজাতীয় পদার্থগুলির ৫০ শতাংশ ভেঙ্গে গিয়ে জারিত হয়ে শক্তি তৈরি করে। এই শক্তির সাহায্যে আমরা নানাধরনের শারীরিক কাজকর্ম করতে পারি। বাকি ৫০ শতাংশ শর্করা ও চর্বি শরীরের বাড়-বৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে লাগে। এছাড়াও শরীরের নানা কোষ-কলার পুনর্জীবিত করতে কাজে লাগে। এর মধ্যে শর্করা আর প্রোটিনের তুলনায় চর্বিজাতীয় পদার্থ প্রায় দ্বিগুণ শক্তি তৈরি করতে পারে। চর্বি জাতীয় পদার্থ আমাদের শরীরে সবচেয়ে বেশি শক্তি তৈরি করে। এছাড়াও শরীর যাতে কিছু ধরনের ভিটামিনকে গ্রহণ করার মাধ্যমে তা ব্যবহার করতে পারে তার জন্য চর্বিজাতীয় পদার্থ প্রয়োজন হয়। এমন একটি ভিটামিন হলো ভিটামিন 'এ'।
- ✓ প্রোটিন কাজে লাগে শরীরের প্রাথমিক কাঠামোটিকে তৈরি করতে; তাই মাংস পেশী, রক্ত, ত্বক, নানান অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাড় এবং অন্যান্য নানান কোষকলা সৃষ্টিতে প্রোটিন কাজে লাগে। ফলে শিশু, গর্ভবতী ও সদ্যোজাত সন্তানের মায়েদের জন্য প্রোটিন অত্যন্ত জরুরি। এছাড়াও নানা ধরনের এনজাইম ও হরমোনের রূপে থাকা প্রোটিনগুলো আমাদের শরীরের মৌলিক প্রক্রিয়াগুলো চালু রাখতে সাহায্য করে।
- ✓ ভিটামিন ও খনিজ (মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট) জাতীয় পুষ্টিগুলি শর্করা, চর্বি জাতীয় পদার্থ ও প্রোটিনের তুলনায় স্বল্প মাত্রায় লাগে। কিন্তু পৌষ্টিক আহারের এরাও প্রধান উপাদান। ভিটামিন

ও খনিজের সাহায্য নিয়ে আমরা সুস্থ থাকি, আমাদের শরীর সঠিকভাবে কাজ করে। আঘাতপ্রাপ্ত কোষকলার মেরামত করে, শিশুর শারীরিক ও মানসিক বাড়-বৃদ্ধিতে সাহায্য করে ও নানারকম সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে। কিছু খনিজ দ্রব্য আমাদের শরীরে নানা অঙ্গের কোষ কলার অংশ যেমন দাঁত ও হাড়ে ক্যালসিয়াম আর ফ্লোরাইড যোগায়। রক্তে আয়রন যায়। রক্তে আয়রন থাকে। অপুষ্টিতে ভোগা ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভিটামিন এ, আয়রন ও আয়োডিনের অভাব দেখা যায়।

আমাদের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলি চালু রাখার জন্য আমাদের প্রত্যেকের প্রত্যেক দিন উপরোক্ত সমস্ত পুষ্টির প্রয়োজন হয়।

গ) আমাদের খাদ্য সামগ্রীর উৎস

খাদ্য ও পুষ্টির খাদ্য আমরা যা খাই, সেই খাদ্যের মূল্যায়ন করতে গেলে ও খাদ্যের গুণমান বাড়াতে গেলে খাবার জিনিসে পুষ্টির পরিমাণ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা থাকা দরকার। নিম্নোক্ত তালিকাটিতে কয়েকটি খাদ্য বস্তুর প্রধান প্রধান পুষ্টির উপাদানের একটা পরিচয় দেওয়া হলো।

নির্দিষ্ট কয়েকটি খাদ্য ও তাদের পুষ্টি উপাদান (১০০ গ্রাম ভক্ষণীয় অংশে)

খাদ্য	শক্তি (কিলো ক্যাল)	প্রোটিন (গ্রাম)	চর্বি জাতীয় (গ্রাম)	আয়রন (মিলিগ্রাম)	ভিটামিন এ/বিটা ক্যারোটিন (মাইক্রো গ্রাম)	ভিটামিন সি (মিলি গ্রাম)
চাল	৩৩৫	৭.০	.৫	১.৭	০	০
ভুট্টা	৩৫০	১০.০	৪.০	২১.০	২.৫	৩
কাসাভা	৩২০	১.৬	০.৫	৩.৬	০	৪
মিষ্টি আলু	১১০	১.৬	০.২	২.০	১ ৮০০	৩৭
বীন	৩২০	২২	১.৫	৮.২	০	১
বাদাম	৫৭০	২৩	৪৫	৩.৮	৮	১
গাজর	৩৫	.৯	.১	.৭	৬ ০০০	৮
কলা	৮২	১.৫	.১	১.৫	৯০	৯
পেঁপে (কাঁচা)	৩০	.৪	.১	.৬	৩০০	৫২
মাংস (মুরগি)	১৪০	২০.০	৬.৫	১.১	৭.৫	০
মাছ	১১৫	২২.০	৩.১	১.৭	০	০
দুধ	৭৯	৩.৮	৪.৮	০.০	২.৭	১
তেল (উদ্ভিদজাত)	৯০০০	০	১০০.০	০.০	০	০
চিনি	৩৭৫	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০

তালিকাটি দেখে বোঝা যাচ্ছে বেশির ভাগ খাদ্যসামগ্রীতে একাধিক পুষ্টিকর পদার্থের মিশ্রণ থাকে। একমাত্র তেল ও চিনিতেই একটি পুষ্টি উপাদান রয়েছে (যেমন তেলে রয়েছে চর্বিজাতীয় পদার্থ আর চিনিতে রয়েছে শর্করা)। এছাড়া এই দুই খাবারে আর কোনও পুষ্টিকর উপাদান নেই।

তাছাড়া তালিকা থেকে বোঝা যাচ্ছে খাবারের জগতে সাম্যের স্থান নেই এবং নানান দল রয়েছে। আর প্রত্যেক খাদ্য দলে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ মাংস জাতীয় খাবারগুলিতে প্রোটিনের মাত্রা বেশি ও কেউ কেউ আবার চর্বিজাতীয় পদার্থে ভরপুর। অথচ সবজিতে ভিটামিন এ ও সি ভর্তি।

মোদ্দা কথা :-

- ✓ কোনও একক খাবার থেকে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় সবকিছু পুষ্টি উপাদান কখনোই পাবো না।
- ✓ তেমনই কোনও আদর্শ খাদ্যবস্তুর অস্তিত্ব নেই যার মধ্যে সব বা প্রায় সব পুষ্টি উপাদান বহুল পরিমাণে রয়েছে।
- ✓ কোন কোন খাদ্যবস্তুতে বিশেষ ভাবে একটি বা দুটি পুষ্টি উপাদানের প্রাধান্য দেখা গেলেও অন্যান্য উপাদানগুলি এই খাবারে তুলনামূলক ভাবে কম থাকে। (তবে এই নিয়মের ব্যতিক্রম একমাত্র স্তন্য দুধে দেখা যায়, যা ছয়মাস অধি একটি শিশুর প্রধান পথ্য)
- ✓ প্রত্যেকটি পুষ্টি উপাদানের জন্য একাধিক বিভিন্ন ধরনের খাবার উৎস রয়েছে।

ঘ) প্রয়োজনীয় পথ্য

১) বৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তা

পথ্য সম্বন্ধে শেষ কথা কী? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, সকল রকম পুষ্টি পেতে হলে আমাদের বিভিন্ন প্রকারের খাবার খেতে হবে। সুস্বাস্থ্যের জন্য বৈচিত্র্যপূর্ণ পথ্য খাওয়া অত্যন্ত জরুরি। বিভিন্ন ধরনের খাদ্য বস্তুর সাহায্য নিয়ে আমরা আমাদের খাদ্যশক্তি ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ করি। অর্থাৎ আমরা নির্ভর করি বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যকর পথ্যের উপর যা আবার আমাদের স্থানীয় রুচির সঙ্গে মানানসই। অনেক পরিমাণে খাবার খেয়েও আমাদের সুন্দর স্বাস্থ্য নাও হতে পারে। এর কারণ হলো বিভিন্ন ধরনের উপযুক্ত খাবার না খাওয়া। আমাদের শরীরের সঠিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন নানা রকমের পুষ্টির, যা আসে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সম্ভার থেকে। নিচে এই খাদ্যসম্ভার বা দলের ছবি দেওয়া হলোঃ

পারে না। সেই জন্য মায়ের দুধ ছাড়াও দিনে চার থেকে পাঁচ বার খাবার খাওয়ার দরকার পড়ে। এর ফলেই এই বয়সী শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে এবং তারা সুস্থও থাকে। দেড় থেকে দুই বছর অবধি বাচ্চাদের দাবী অনুসারে মায়ের দুধ দেওয়া উচিত। প্রত্যেকটি বাড়ন্ত শিশু এমনকি যাদের স্কুলে যাওয়ার বয়স হয়েছে তাদেরও খাবারের চাহিদা প্রচন্ড পরিমাণে থাকে। যদিও তাদের পাকস্থলীর আকার ছোট, ফলে তাদের বারে বারে খেতে হয়, অন্তত দিনে তিন বার পেট ভরে বড় করে খাওয়া আর তার মাঝে ছোট ছোট জলখাবার।

আর সবার মতো বৃদ্ধদেরও সেই সু-পথ্যের প্রয়োজন, যাতে তাঁরা তাদের পুষ্টির সবরকম চাহিদা পূরণ করতে পারেন। তবে তাঁদের বিশেষ কিছু সমস্যা থাকে। তাঁরা যদি অসমর্থ হন ও পরিশ্রম কম করেন তাহলে তাঁদের শক্তির প্রয়োজনীয়তা কম থাকে, ফলে তাঁদের কম খাবার খেলেও চলে। কম পরিমাণ খাবার খাওয়ার ফলে, তাঁদের শরীরে প্রয়োজনের তুলনায় কম পরিমাণে পুষ্টি উপাদান প্রবেশ করে। অথচ সক্রিয় থাকলেও ঠিক যতটা মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টের দরকার পড়ে, নিষ্ক্রিয় অবস্থাতেও একই পরিমাণ মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া দাঁত বা মাড়ির সমস্যার দরুণ তাঁদের খাবার চিবিয়ে খেতে সমস্যা হয়। মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টের এই অভাব দূর করতে তাঁদের খাদ্যে এই পুষ্টি উপাদান বেশি থাকা উচিত। সহজে চিবিয়ে খাওয়া যায় এমন ধরণের খাবার তাদের দেওয়া উচিত। অসুস্থ হলে মানুষের খিদে কমে যায় আর খাওয়ার পরিমাণও কমে যায়। ফলে তাদের শরীরে অপুষ্টি দেখা দেয়। তার উপর ডায়রিয়া হলে অর্ধেক খাবার শরীর ধরে রাখতে পারে না। তাছাড়া সংক্রমণে আক্রান্ত রোগীদের পুষ্টির চাহিদা সুস্থ মানুষের তুলনায় বেশি হয়। অসুস্থদের এমন খাবার দেওয়া দরকার যেটা হবে রুচিকর, অথচ হালকা এবং প্রোটিন ও মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টে ভরপুর।

অনেক সময়, পরিবারে ব্যক্তিগত খাদ্য চাহিদা/প্রয়োজনগুলো স্বীকৃতি পায় না। তার প্রথম কারণ সামাজিক রীতিনীতি। কখনও বা সময়ের অভাব, আবার কখনও এই ব্যক্তিগত চাহিদা, পছন্দ অপছন্দ পরিবারের সদস্যরা কাউকে মুখ ফুটে জানায় না। সামাজিক রীতিনীতির ক্ষেত্রে দেখা যায় বহু পরিবারে পুরুষেরা সবার আগে সবার থেকে বেশি খাবারের ভাগ পায়। পুরুষেরা খেয়ে উঠে যাওয়ার পর যা পড়ে থাকে সেটাই পরিবারের মহিলারা ও ছেলেপুলেরা খায়। অনেক পরিবারের বাবা-মা দিনের শুরুতেই কাজে বেরিয়ে যান আর সারাদিনের জন্য ছেলেমেয়েরা বাড়িতে একা একা নিজেদের দেখাশোনা করে। খাওয়ার ব্যবস্থা করে। অভ্যাস বা ঘটনাগুলি সংবেদনশীল হলেও ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধিতে যদি এই অভ্যাসগুলি বাধ সাধে, তাহলে এই সব বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

৩) স্কুলে যাওয়া শিশুদের খাবারের চাহিদা কেমন ?

স্কুলে যাওয়া বাচ্চাদের কেন সু-খাদ্যের প্রয়োজন হয়

পরিবারের অন্যদের মতো একটি স্বাস্থ্যকর সুস্বাদু প্রাথমিক স্কুল স্তরে তাদের মধ্যে ১১ থেকে ১৬ বছর ঘটে। শিশুরা তাদের চূড়ান্ত পরিমাণটাই ১০-১৮ বছর ফেলে। ফলে এই দুর্বীর শারীরিক কাজকর্মকে শিশুদের পর্যাপ্ত খাদ্যের প্রয়োজন হয়। এই পথ্য যেন তাদের শরীরিক শক্তি ও পুষ্টির চাহিদার যোগান দিতে পারে।



স্কুলে যাওয়া শিশুদের পথ্যের প্রয়োজন হয়। বাড়-বাড়ন্ত সীমাহীন। তার বয়সে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি শারীরিক ওজনের অর্ধেক বয়সের মধ্যে অর্জন করে গতিতে বেড়ে ওঠা ও সামাল দিতে এই বয়সী

সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই বয়সী মেয়েরা যেন যথার্থ পুষ্টিপূর্ণ পথ্য গ্রহণ করে, যাতে বড় হয়ে তারা সুস্থ সন্তানের জন্ম দিতে পারে। বয়ঃসন্ধির ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে শক্তির প্রয়োজন হয়। এই জন্য তাদের এই বয়সে প্রচুর খিদে পায় ও তারা প্রচুর খেতেও পারে।

যে সব স্কুলে যাওয়া শিশুর সু-পথ্য জোটে না, যারা ক্ষুধার্ত থেকে যায়, তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত সমস্যাগুলো দেখা যায় :

- ✓ শারীরিক বৃদ্ধি হয় ধীর গতিতে
- ✓ খেলাধূলা করার শক্তি থাকে না, পড়াশোনা ও শারীরিক কোনও কাজ করতেও শক্তি পায় না
- ✓ মনোযোগের অভাব লক্ষ্য করা যায়, স্কুলের কাজ ভালোভাবে করতে পারে না
- ✓ ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের অভাবে ভোগে (ভিটামিন, আয়রণ ও আয়োডিনের অভাব দেখা যায়), স্কুলে যাওয়া বাচ্চাদের মধ্যে নানান মাত্রায় শক্তির চাহিদা লক্ষ্য করা যায়। শক্তি চাহিদা নির্ভর করে : শিশুর শারীরিক আকার (উচ্চতা, ওজন), লিঙ্গ, শারীরিক কাজকর্মের ধরণধারণ (খেলাধূলা, কাজ ইত্যাদি) এর উপর। নিচে ছেলে ও মেয়েদের বয়স অনুসারে শক্তি চাহিদার তালিকা দেওয়া হলো। ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, এই বয়সী ছেলে ও মেয়েরা মধ্যম মাত্রায় শারীরিক কাজকর্ম করে থাকে।

স্কুলে যাওয়া বাচ্চাদের শক্তি চাহিদা (কিলো ক্যালোরি)

বয়স (বছর)	ছেলে	মেয়ে
৭ - ৯	১ ৭৬০	১ ৬২৫
১০ - ১২	২ ২৫০	২ ০৭৫
১৩ - ১৪	২ ৭৭৫	২ ৩৭৫

স্কুলে যাওয়া শিশুদের পথ্যের চাহিদা কিভাবে মেটানো হবে: প্রাপ্ত বয়স্কদের মতো স্কুলের শিশুদেরও প্রয়োজন এক মিশ্র ও সুষম পথ্য। যার সাহায্যে তারা:

- ✓ প্রয়োজনীয় সব পুষ্টির চাহিদা মেটাতে পারবে।
- ✓ প্রতিটি শিশুর শক্তি চাহিদার যোগান হবে।
- ✓ ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য থেকে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের খাদ্য মিশ্রণ তৈরি করা যাবে।
- ✓ খেতে সুস্বাদু হবে যা ছোটদের ভালো লাগবে।
- ✓ পথ্যটি তৈরি করতে কোনও অ-সাধারণ প্রচেষ্টা লাগবে না (সময় ও মূল্যের প্রেক্ষিতে)। সু-স্বাস্থ্য পেতে, সক্রিয় ও তৎপর থাকতে এবং বাড়-বৃদ্ধি যাতে যথার্থ হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে স্কুলে যাওয়া বাচ্চাদের দিনে তিন বার সকালে, দুপুর ও রাতে পেটভরে খাবার খাওয়া উচিত আর এর মাঝে দু-এক বার জলখাবার খাওয়া দরকার।
- ✓ প্রাতরাশ : সকালের এই ভোজনপর্বই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত শিশুরা যখন অনেকটা পথ হেঁটে স্কুলে যায় এবং দুপুরের খাবারটা বেশি করে খাওয়ার সুযোগ পায় না। প্রাতরাশ বলতে বোঝায় শর্করাপূর্ণ যে কোনও খাদ্য (যে কোনও ধরনের খিচুড়ি বা রুটি) আর তার সঙ্গে থাকবে দুধ, মাখন, কিছু ফল।
- ✓ দুপুরের খাবার : এই সময় মিশ্র প্রকারের খাবার দেওয়া উচিত, যাতে থাকবে : রুটি, ডিম ও ফল। বাচ্চা যদি খাবার কিনেও খায় তবে তার ধারণা থাকা উচিত যে টাকার বিনিময়ে কোন ভালো খাবারটা সে কিনে খাচ্ছে। স্কুল যদি মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা করে তাহলে সেই মিল যেন যথাসম্ভব স্বাস্থ্যকর ও সুষম হয়।
- ✓ সারাদিনের সবচেয়ে বড় ভোজন : সারাদিনের পরে এই ভোজন সময়টি একটি শিশুর কাছে সবচেয়ে বড় আকারে আসে। কারণ প্রাতরাশ আর দুপুরের খাবার তাকে দ্রুততার সঙ্গে সারতে হয়েছে। ফলে এই সময়ের খাদ্যতালিকা সবচাইতে বেশি স্বাস্থ্যকর আর সুষম হওয়া দরকার। মনে রাখতে হবে এই বয়সের বাচ্চারা বেশি খেতে চায়, কারণ তাদের শরীর তীব্র গতিতে বাড়ে। তাদের খেতে চাওয়ার কারণ সমসময়ে লোভের তাড়নায় আসে না।
- ✓ জলখাবার : প্রতিদিনের নিয়মিত ভোজনপর্বগুলি বাদ দিলে অতিরিক্তি ছোট ছোট খাওয়াগুলিকে জলখাবার বলে জানি। এই জলখাবারগুলির খাদ্যতালিকাতেও যেন শক্তিপূর্ণ ও পুষ্টিপূর্ণ খাবার থাকে। এই বয়সী বাচ্চাদের জানা দরকার যে টাকার বিনিময়ে কিছু মুখরোচক খাবার, যেমন – মিষ্টি, লজেন্স, সোডা-কোলা, ম্যাগ্নেফুটির মতো খাদ্য ও পানীয়গুলোর কোনও উপকারিতা নেই, বরং এগুলি তাদের শরীরের ও দাঁতের ক্ষতি করে।

স্কুলে যাওয়া বাচ্চাদের জন্য উপযুক্ত জলখাবারঃ

- ✓ দুধ, দই
- ✓ রুটি, পরোটা তার সাথে মাখন, চিনেবাদামের মাখন
- ✓ বিস্কুট, ছোলা-বাদাম
- ✓ আলু সেদ্ধ বা আলু ভাজা
- ✓ ভুট্টার দানা
- ✓ কলা, আম, পেয়ারা, লেবু, নারকোলের শাঁস
- ✓ ডিম সেদ্ধ
- ✓ ছোট মাছ ভাজা
- ✓ আখ

যেসব জলখাবারের কোনও গুণ নেই :

এগুলো খেলে টাকার বিনিময়ে স্বাস্থ্য সম্মত খাওয়া হয় না এবং এর মূল্যও কম।

- ✓ সোডা, কোলা, ফুটি
- ✓ মিষ্টি বা চকোলেট
- ✓ আইস-ক্রিম
- ✓ গ্লুকোজ জল, সরবৎ
- ✓ চিপস্

স্কুলে যাওয়া শিশুদের জন্য ভালো ও মন্দ খাবার শিশুরা কী খাবে আর কী খাবে না সে বিষয়ে একটা ধারণা

সাধারণভাবে শিশুর খাদ্য নির্ভর করে তার আঞ্চলিক স্বাস্থ্যবিধি ও পুষ্টিজ্ঞান যেতে পারে যে, শিশুদের অবশ্যই থাকা উচিত তা পুষ্টির চাহিদা ১০০ শতাংশ ৮০ শতাংশ পূরণ করে। মূল পথ্যগুলি পুষ্টিকর



তালিকায় কী থাকবে তা খাদ্যাভাসের উপর। তবে বিচার করলে এটা বলা খাবারের তালিকায় যা হলো : এমন খাদ্য যা শিশুর পূরণ করে ও শক্তির চাহিদা অর্থাৎ যদি শিশুর সারাদিনে খাবার দিয়ে ভরে থাকে

তাহলে ছোট ছোট পরিমাণে “অপুষ্টিকর” খাবারগুলি (মিষ্টি, ভাজা) খাওয়া যেতেই পারে। তবে কেক, বিস্কুট, মিষ্টি জ্যাম-জেলি, চিনির মতো সহনযোগ্য খাবার সামগ্রীগুলো যেন মোট পথ্যের ২০ শতাংশের বেশি না হয়। খাদ্যে আলাদা করে দেওয়া চিনির ব্যবহার যেন ১০ শতাংশের বেশি না হয়। নিচে একটা খাদ্য পরিমাণের তালিকা দেওয়া হলো। এই পরিমাণগুলো ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং শিশুর শারীরিক ওজন, আকার ও পরিশ্রমের মাত্রার উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া এই পরিমাণগুলি দেশ, কাল, স্থানীয় আচার, রুচি অভ্যাসের উপরেও নির্ভরশীল। যেমন, এখানে যে পরিমাণ চর্বিজাতীয় খাবার ও প্রাণীজাত খাদ্যের কথা বলা হয়েছে, সেই পরিমাণ খাবার যদি কোনও অঞ্চলে সাধারণভাবে খাওয়ার চল না থাকে তাহলে শিশুর জন্য বিশেষ ভাবে ওই ধরনের খাদ্য বস্তুর পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে। উদ্ভিদজাত খাবার খাওয়ার জন্য নিয়ন্ত্রণ নেই। একইভাবে তরল খাবারের জন্য কোনও সীমা বেঁধে দেওয়া হলো না।

স্কুলে যাওয়া শিশুদের জন্য সুপারিশ করা খাদ্য পরিমাণঃ

খাবার	পরিমাণ	বয়স		
		৭ - ৯ বছর	১০-১২ বছর	১৩-১৪ বছর
প্রচুর পরিমাণে				
তরল	মিলি/প্রতিদিন	৯০০	১ ০০০	১ ২০০
শস্যজাত - রুটি, চাল	গ্রাম/প্রতিদিন	৩৪০	৪১০	৪৮০
শর্করা - আলু	গ্রাম/প্রতিদিন	২০০	২৩০	২৫০
সবজি, ডাল	গ্রাম/প্রতিদিন	২০০	২৩০	২৫০
ফল	গ্রাম/প্রতিদিন	২০০	২৩০	২৫০
পর্যাপ্ত / মধ্যম পরিমাণে				
দুধ ও দুধজাত	মিলি/প্রতিদিন বা	৪০০	৪২০	৪৫০
মাংস ও মাংসজাত	গ্রাম/প্রতিদিন	৫৫	৬৫	৭৫
ডিম	কটা/প্রতি সপ্তাহে	২	২ - ৩	২ - ৩
মাছ	গ্রাম/প্রতি সপ্তাহে	১৫০	১৮০	২০০
অল্প করে				
তেল, মাখন, ঘি	গ্রাম/প্রতিদিন	৩০	৩৫	৩৫
সহনীয় খাদ্য				
কেক, বিস্কুট, মিষ্টি	গ্রাম/প্রতিদিন	৫০ অবধি	৮০ অবধি	৮০ অবধি
জ্যাম, চিনি	গ্রাম/প্রতিদিন	১০ অবধি	২০ অবধি	২০ অবধি

ইদানিং কালে মিশ্র ও বয়ঃসন্ধির ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্থূলতা বা মোটা হয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। উন্নয়নশীল ও শিল্পকেন্দ্রিক দেশগুলির শহরাঞ্চলে এই প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। অতিরিক্ত চর্বিজাত খাবার, যেগুলি প্রচুর মাত্রায় শক্তিপূর্ণ, সেইসব খাবার বেশি পরিমাণে খাওয়ার জন্যই এটা ঘটছে। নানা ধরনের সোডা, কোলা, মিষ্টি যাদের মধ্যে চিনির পরিমাণ বেশি, অতিরিক্ত মাত্রায় খেলেও স্থূলতা বৃদ্ধি পায়। এর সাথে অন্যান্য রোগও তৈরি হয়। পর্যাপ্ত পরিশ্রমের অভাব আর তার সাথে একই ধরনের খাবার খাওয়ার ফলে শরীরের ওজন বেড়ে যায়।

ঙ) কীভাবে আমরা মিশ্র ও সুসম পথ্য তৈরি করব

১. পথ্য সংক্রান্ত নির্দেশিকা

এমন বহু দেশ আছে যেখানকার বিশেষজ্ঞরা সে দেশের খাদ্যাভ্যাসের পর্যালোচনা করে একটি পথ্য নির্দেশিকা তৈরি করেছেন, যার সাহায্যে দেশের মানুষ এক স্বাস্থ্যসম্মত খাবার-দাবার গ্রহণ করতে পারে। এই নির্দেশিকাগুলি সেই সব দেশের সাধারণ মানুষের খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং উপযুক্ত। অর্থাৎ একটি দেশের খাদ্যবস্তুর প্রকৃতি তাদের পুষ্টি মাত্রা ও সার্বিক স্বাস্থ্য অবস্থার সঙ্গে তালমিলিয়ে এই নির্দেশিকা তৈরি হয়। একটি দেশের পথ্য নির্দেশিকা অন্য দেশে ব্যবহার করতে গেলে ব্যবহারকারী দেশের স্বাস্থ্য ও খাদ্য, পুষ্টির পরিস্থিতি অনুযায়ী বদলে নিতে হয়। এই পথ্য নির্দেশিকার সাহায্যে খাবার-দাবার ধরণ ছাড়াও সু-স্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়গুলি যেমন : জীবনধারণ পদ্ধতি, স্বাস্থ্য বিধি ও ময়লা জল-আবর্জনা দূর করার পদ্ধতিগুলির সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়।

দেখা যাচ্ছে, পথ্য নির্দেশিকাতে শিশুদের পুষ্টির কথা আলাদা করে নির্দিষ্টভাবে বলা থাকে না। তবে যা নির্দেশ দেওয়া থাকে সেগুলি শিশুদের জন্য উপযুক্ত। কিছু কিছু দেশের পথ্য নির্দেশিকাগুলি ছবির মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। একটা বৃত্ত বা পিরামিডের ছবি দিয়ে পথ্য সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হয়। ওই বৃত্ত বা পিরামিডের নানা আকারের অংশ ভাগ করা থাকে এবং একটা অংশ এক এক ধরণের খাদ্যকে নির্দেশিত করে। দেশের পথ্য নির্দেশিকাটির সাহায্যে আমরা আমাদের অঞ্চলের পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়গুলি বুঝতে পারি এবং এর সাহায্যে পুষ্টি সংক্রান্ত শিক্ষায় কোন বিষয়গুলি প্রাধান্য পাবে তা নির্ধারণ করতে পারি।

এই নির্দেশিকা কাজে লাগিয়ে আমরা বাবা-মা, বা স্বাস্থ্য নিয়ে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের সবার সঙ্গে বরং স্কুলের বাচ্চাদের সঙ্গেও পুষ্টি সংক্রান্ত আলোচনা শুরু করতে পারি।



আমরা স্কুলে, পাড়ায় বা বাবা-মায়ের সঙ্গে কোন ধরনের পুষ্টি সংক্রান্ত কার্যক্রম করতে পারি পথ্য নির্দেশিকার সাহায্যে তার ধারণাও পাওয়া যায়।

২) স্থানীয় / আঞ্চলিক পথ্য

আঞ্চলিক পথ্য :

স্থানীয় পথ্য নির্দেশিকাটি স্থানীয় অঞ্চল কেন্দ্রিক হওয়া দরকার। তবে, প্রায় সকল নির্দেশিকাতেই নানা ধরনের খাবার খাওয়ার কথা বলা হয়ে থাকে। তার কারণ আমরা আগেই দেখেছি কোনও এক ধরনের খাবার সবকটা পুষ্টি উপাদানের যোগান দেয় না।

বিশ্বের সব অঞ্চলের স্থানীয় খাদ্যাভ্যাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যে সব জায়গাতেই নানা ধরনের, নানা রকমের খাবার খাওয়ার চল রয়েছে, যার সাহায্যে স্বাস্থ্যের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ঘটে। তবে সব ধরনের খাবার সবাই জোগাড় করতে পারে কি না সেটা মাথায় রাখতে হবে। পথ্যের মান উন্নতিতে এই নানা ধরনের খাবার খাওয়ার বিষয়টি ব্যবহার করতে হবে। অতএব দেখা যাচ্ছে বাস্তবে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস চর্চা করতে হলে প্রধান খাদ্য বস্তুটি খাওয়ার সাথে সাথে (ভাত, আটা, বাজরা ইত্যাদি) আরও অন্যান্য সহযোগী খাদ্য সামগ্রী যেমন : সবুজ পাতাওলা শাক, সবজি, ডাল, মাছ, মাংস, ডিম, দুধজাত খাবার, চিনি, তেল, ফল এবং অবশ্যই জল খেতে হবে।



প্রধান খাদ্যের সঙ্গে সহযোগী খাদ্য বস্তুগুলো আমাদের যা দেয়ঃ

- ✓ অতিরিক্ত শক্তি – তেল, বাদাম, মটর
- ✓ অতিরিক্ত প্রোটিন – মটর, বাদাম, মাংস, মাছ
- ✓ অপরিহার্য মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট – সবজি, ফল, মাছ, মাংস
- ✓ সহযোগী খাদ্য বস্তুগুলো খাবারের মধ্যে গন্ধ, রঙ ও বিভিন্ন গঠন (যেমন – তরল, নরম মুচমুচে) যুক্ত করে খাবারের স্বাদ বাড়িয়ে তোলে। এর ফলে ভোজনপর্বগুলি আকর্ষক হয় ও আমাদের আহারে রুচি হয়। খাবারের রুচি তৈরি হলে আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে ঠিকঠাক খাবার খেতে উৎসাহিত হই। যা একঘেয়ে খাবার দিতে পারে না।

মনে রাখা জরুরি

স্বাস্থ্যকর আহারের উপাদান হলো একটি প্রধান খাদ্য বস্তুকে ঘিরে অল্প পরিমাণে সবজি, ডাল, মাছ, মাংস একটি স্বাস্থ্যকর ও সুস্বাদু পথ্য পেতে হলে সবচেয়ে আগে দরকার সবার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য। যে খাদ্য সম্ভারে থাকে বিভিন্ন ধরনের খাবার, যেগুলোর সাহায্যে পরিবারের সবার মোট পুষ্টির চাহিদা পূরণ হবে। এর জন্য জটিল ও বহুমূল্যের খাবার-দাবারের প্রয়োজন নেই। পথ্যে উন্নতি আনতে স্থানীয় ভাবে যে সব খাবার জিনিস যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় সেগুলো পথ্য তৈরিতে কাজে লাগাতে হবে। এর একটা কারণ যেমন অর্থনৈতিক, তেমনি এটা মনে রাখা দরকার যে স্থানীয় খাবার সুস্থায়ী হয়। আর তাছাড়াও মানুষ যেহেতু অভ্যাসের দাস, খাদ্যাভ্যাসের বড় পরিবর্তন মেনে নেওয়াটা তাদের পক্ষে অসুবিধের হয়।

ফলে পথ্যে পুষ্টিমূল্য বাড়াতে ছোট-ছোট পরিবর্তন ও সংযোজনের মাধ্যমেই করা শ্রেয়। পরিবারের জন্য মিশ্র ভোজন নির্দেশিকা থেকে আমরা জানতে পারি কীভাবে আমরা পরিবারের জন্য মিশ্র, পুষ্টিকর অথচ সুস্বাদু খাবার তৈরি করব। এর জন্য প্রথমে আমাদের স্থানীয় প্রধান খাদ্য বস্তু (যেমন আমাদের অঞ্চলের ক্ষেত্রে ভাত) দিয়ে শুরু করে তার সঙ্গে স্থানীয়ভাবে যে সব খাবার জিনিস পাওয়া যায় ও খাওয়ার চল আছে সেগুলো যুক্ত করব। আমাদের দেখে নিতে হবে মূল বা প্রধান খাদ্য বস্তুটিতে কোন কোন পুষ্টি উপাদান কম আছে। সেই অভাব পূরণ হবে সহযোগী খাদ্যসম্ভার দিয়ে, যেমন ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য। এটি শর্করা জাতীয়। ফলে সহযোগী খাদ্য তালিকায় থাকবে প্রোটিন জাতীয় খাবার। এর জন্য আমাদের স্থানীয় খাদ্য ভান্ডারের পুষ্টিগুণ জেনে রাখা জরুরি। এইভাবে একটি পরিবার যদি প্রতিদিন এই ধরনের মিশ্র খাবার খাওয়ার চর্চা করেন এবং সাথে সাথে পরিবারের সমস্ত সদস্যদের (যেমন শিশু, গর্ভবতী, মহিলা, স্তনদানরত মহিলা) ব্যক্তিগত পুষ্টি চাহিদাগুলোর খেয়াল রাখেন, তাহলে সেই পরিবার অবশ্যই স্বাস্থ্যকর ও সুস্বাদু পথ্য উপভোগ করতে পারবেন এবং এই স্বাস্থ্যকর ও সুস্বাদু পথ্যই পুষ্টি সংক্রান্ত ভালো থাকা, স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধির ভিত্তি।

স্বাস্থ্যকর পথ্য মোটেও জটিল ও দামী নয়

চ) নিয়মিত ভাবে খাদ্য সরবরাহ

পুষ্টি পেতে হলে বেশ কয়েকটি যোগ্যতা প্রয়োজন হয়। একটি পথ্য তখনই সু-পথ্য বলা যাবে যখন তার উপাদানে নানা ধরনের পুষ্টিযুক্ত খাদ্যবস্তু থাকবে, যেগুলি নিরাপদ ও পরিবারের সকল সদস্যের চাহিদা মেটাবে। এছাড়াও পরিবারের সবাই যেন নিয়মিতভাবে সেই খাবারের যোগান পান। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা এটা জেনেছি যে প্রতিদিনই আমরা ক্ষুধার্ত হই। জলের উপর নির্ভরশীলতা লক্ষ্যণীয়। আমরা না খেয়ে কিছুদিন হয়তো থাকতে পারি কিন্তু জল ছাড়া কোনও পূর্ণবয়স্ক মানুষ তিনদিনের বেশি বেঁচে থাকতে পারে না। ছোটরা তো আরও কম দিন।

আমাদের কেন নিয়মিত খেতে হয়? তার কারণ মানুষের শরীর পুষ্টি যুক্ত কয়েকটি উপাদান বেশি মাত্রায় জমিয়ে রাখতে পারলেও অন্য অনেক উপাদানকে জমা রাখতে পারে না। এই ফারাক বেশ লক্ষ্যণীয়, যেমন চর্বি'র সাহায্যে আমাদের শরীর কয়েক সপ্তাহের জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। আমাদের শরীরের কয়েকটি ভিটামিন ও খনিজ ভান্ডারটিও বেশ কয়েক মাসের জন্য রসদ জমা রাখতে পারে। কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় ভিটামিনগুলি যেমন: ভিটামিন সি, ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন বি-১২ জমানো সম্ভব হয় না। কিছুদিনের মধ্যেই তারা ফুরিয়ে যায়। ফলে পুষ্টির অভাব তাড়াতাড়ি ঘটতে থাকে। এর ফলে যে সব রোগ দেখা দেয়, তার ফলে জমানো ভিটামিনের রসদে টান পড়ে এবং তাদের ক্ষয় হতে শুরু করে। শিশুদের শরীর যেহেতু আকারে ছোট, তাই এদের শরীরের পুষ্টি ক্ষয়ের ঝুঁকি বেশি। তাছাড়া যেহেতু শিশুরা বেশি মাত্রায় সংক্রমণ রোগে আক্রান্ত হয়, ফলে জমানো পুষ্টির ভান্ডারে ক্ষয় বেশি দেখা যায়। তাছাড়া শিশুদের বাড়ন্ত শরীর পুষ্টি উপাদানের চাহিদা বাড়ায়। ফলে সারা বছর ধরে পরিবারের মধ্যে সব ধরনের সদস্যদের জন্য নানা ধরনের খাদ্য সামগ্রীর যোগান অপরিহার্য।

যেসব ঋতুকালগুলিতে চরম খারাপ আবহাওয়া দেখা দেয়, সেই সময়গুলি দরিদ্র মানুষেরা কম পরিমাণ খেয়ে বা দু-এক ধরনের খাদ্যদ্রব্যের উপর নির্ভর করে দিন কাটান। সেই সময়গুলিতে পথ্যে উন্নতি আনার প্রয়াস নিতে হবে। পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তার পথ্যে স্থিতিশীল খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

ছ) উপসংহার

স্বাস্থ্যকর পথ্য তৈরি হয় স্থানীয় খাদ্যাভ্যাসের উপর ভিত্তি করে। এই পথ্যে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত বস্তু ব্যবহৃত হয় স্থানীয় খাদ্যরচিকেকে মাথায় রেখে।

স্বাস্থ্যকর পথ্য তাকেই বলে যেটাঃ

- ✓ বিভিন্ন খাদ্য থেকে আসা বিভিন্ন ধরনের খাবারকে নিয়মিত রূপে অন্তর্ভুক্ত করে।

- ✓ সব ধরনের মানুষের সবকটা চাহিদা যেমন, খাদ্য থেকে শক্তি, পুষ্টি মেটাতে পারে।
- ✓ নিরাপদ অর্থাৎ বিষক্রিয়ার ভয় নেই, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হাতে পরিবেশিত হয়।
- ✓ সবাই উপভোগ করবে ও পছন্দ করবে। অর্থাৎ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি মেনে এই পথ্য তৈরি হবে।
- ✓ সারা বছরের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাবে। বছরের যে কোনও সময় সবাই ভালো ভাবে খেতে পারে।

প্রধান পুষ্টি উপাদান, তাদের কাজ ও উৎস

পুষ্টি উপাদান	কাজ	উৎস (খাদ্য বস্তু)
ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্টের প্রোটিন	মাংস পেশি, রক্ত, ত্বক, হাড়, কোষকলা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তৈরি করে। এনজাইম ও হরমোন হিসাবে শরীরের বিপাকীয় ক্রিয়ায় কাজে লাগে।	সকল ধরনের মাংস, পোলট্রি খাদ্য, মাছ, মটর, সোয়া, বাদাম, দুধ, ছানা, দই, ডিম
শর্করা	শক্তি সঞ্চয় করে।	সব ধরনের শস্য (চাল, গম, বাজরা); শেকড় জাতীয় (আলু); ফল; চিনি
স্নেহ	শক্তি সঞ্চয় করে। কিছু স্নেহ পদার্থ শরীর গঠনে কাজে লাগে। ভিটামিন ব্যবহারে কাজে লাগে।	সবজি, প্রাণী তেল, ঘি, মাখন, মাংস ও মাংসজাত খাদ্য; কিছু ধরনের মাছ, বাদাম, সোয়াবিন
মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট ভিটামিন এ	শরীর নানান অঙ্গের কোষকলার গঠন ও স্বাস্থ্য রক্ষা করে যেমন চোখ, ত্বক, হাড়, শ্বাসনালী ও খাদ্যনালী। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে কার্যকরী রাখে।	আমাদের শরীর উদ্ভিদের B-Cardtens থেকে ভিটামিন 'এ' তৈরি করে। এছাড়াও স্তন্য দুধ, মেটে, ডিম, দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার, রঙিন ফল ও সবজি (গাজর, কুমড়া, আম, পেঁপে)
ভিটামিন বি	শর্করা, প্রোটিন ও স্নেহ পদার্থ থেকে শক্তি তৈরি করতে প্রয়োজন হয়। কোষ-কলা তৈরি ও মেরামতিতে কাজে লাগে। ফলিক অ্যাসিড রক্ত কণা তৈরি করে।	গাড় সবুজ সবজি, বাদাম, মটর, শস্য, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ জাতীয় খাদ্য
ভিটামিন সি	আয়রণ শোষণে সাহায্য করে, সংযোগকারী কোষ কলা তৈরিতে কাজে লাগে। অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট হিসাবে কাজ করে।	স্নেহ জাতীয় ফল, পেয়ারা, আলু
ভিটামিন ডি	শরীরে ক্যালসিয়াম ব্যবহৃত হতে সাহায্য করে	মাছ-তেল, ডিম, দুধ, সূর্য আলোর সাহায্যে ত্বকে তৈরি হয়
আয়রণ	লাল রক্ত কণিকার মূল উপাদান, শরীরের সকল কোষের কাজে সাহায্য করে।	মেটে, মাংস, শস্য (গোটা দানা), ডিম, মাছ, ডাল, সবুজ পাতাওলা শাক সবজি, শুকনো ফল, উদ্ভিদ থেকে পাওয়া আয়রণ ভিটামিন সির সাহায্যে শোষিত হয়, প্রাণী থেকে পাওয়া আয়রণ সহজে শোষিত হয়।

ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস	শরীরের রক্ষণাবেক্ষণে সাহায্য করে। সবল দাঁত আর হাড় এর উপাদান	দুধ ও দুধ জাতীয় খাবার, ছোট মাছ, মটর, গাঢ় সবুজ পাতাওলা শাক ও ভুট্টা।
আয়োডিন	শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি	সমুদ্রজাত খাদ্য, আয়োডিন যুক্ত লবণ
অতিরিক্ত ছিবড়া (যা শরীরে শোষিত হয় না, হজম হয় না), জল	অন্যান্য নিউট্রিয়েন্টকে বহন করে। পথ্যকে ভারি করে। শরীরের মধ্যে ভালো ব্যাকটেরিয়ার বাসস্থান। মল তৈরি করতে সাহায্য করে। শরীরে তরল যোগায় ও তাপমাত্রা বজায় রাখে	গোটা দানার শস্য, শর্করা যুক্ত শিকড়-বাকড়, ফল, সবজি, মটর তৈলবীজ।

অপুষ্টি ও তার কারণঃ

উদ্দেশ্যঃ

- ✓ প্রধান কয়েক ধরনের অপুষ্টি ও তার ফলাফল সম্বন্ধে জানা
- ✓ ক্লাসরুমের সদস্যদের মধ্যে অপুষ্টির সঙ্কেত চিহ্নিত করতে পারা
- ✓ অপুষ্টির জটিল কারণ সম্বন্ধে ধারণা
- ✓ অপুষ্টি প্রতিরোধকারী কৌশলগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়া, বিশেষ করে অপুষ্টি রোধে শিক্ষার ভূমিকা।

বিষয়ঃ

- ✓ সাধারণ কয়েকটি অপুষ্টি ও তার ফলাফল
- ✓ বিপদ সঙ্কেত চেনা
- ✓ অপুষ্টির কারণ
- ✓ অপুষ্টি প্রতিরোধের জন্য কৌশল
- ✓ পাড়া এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ
- ✓ শিক্ষা ও স্কুলের ভূমিকা

মূল বার্তাঃ

- ✓ বিপদ সঙ্কেত সম্বন্ধে শিক্ষকেরা ওয়াকিবহাল থাকবে
- ✓ অপুষ্টির অনেক কারণ রয়েছে
- ✓ শিক্ষা অপুষ্টিকে প্রতিরোধ করতে পারে

সারাংশঃ

এই পর্বে প্রধান কয়েক ধরনের অপুষ্টি, তাদের লক্ষণ ও ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। স্কুলে কী উপায়ে অপুষ্টি চিহ্নিত করা সম্ভব হবে এবং অল্প সময়ের মধ্যে তাকে কীভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব সেটা আলোচনা করা হয়েছে। অপুষ্টির জটিল কারণ ও কীভাবে এই কারণগুলি প্রতিরোধ করা সম্ভব সে সম্বন্ধে জানা যাবে। শিক্ষার প্রভাব কী এবং স্কুলে কেন স্বাস্থ্যকর পুষ্টির কথা জানা দরকার সে সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যাবে।

এই পাঠটি আপনাদের কীভাবে কাজে লাগবেঃ

- ✓ অপুষ্টির প্রকার, সঙ্কেত চিহ্ন সম্বন্ধে তথ্য ও ধারণা পাওয়া যাবে। কীভাবে অপুষ্টির কারণে একজন শিশুর ক্লাসরুমের আচরণ প্রভাবিত হয় তা জানা যাবে।
- ✓ এই পাঠে যে সব কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে পুষ্টি বিশারদ ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা নিজেদের ধ্যানধারণাগুলো যেন মিলিয়ে নেন।
- ✓ অপুষ্টির মূল কারণ সম্বন্ধে আপনাদের সবাইকে একমত হতে হবে। “পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা”-র মতো ধারণাটির বিষয়ে সহমত হতে হবে। এই দুটির সাহায্যে দেশের পুষ্টি সমস্যার কারণ নির্ধারণ করতে হবে।
- ✓ স্কুল ও শিক্ষার ভূমিকার কথা জানা যাবে। স্থানীয় পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়টিতে স্কুলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করতে হবে।
- ✓ পাঠে দেওয়া পোস্টারটি আলোচনার সময় ব্যবহার করতে পারেন।

অপুষ্টি সংক্রান্ত মূল ধারণা ও তথ্যের জন্য সব কার্যবিধিগুলিই কাজেই লাগবে যা এককভাবে বা দলে করা যাবে। যাঁরা শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি জড়িত নন তাঁরা কার্যবিধি ৩, ৪, ৫ এর সাহায্য নেবেন। কার্যবিধি ৬, ৭ থেকে অপুষ্টির কারণ ও শিক্ষার ভূমিকা সম্বন্ধে ধারণা তৈরি করা যাবে।

কার্যবিধি ১ : নাম-তালিকা

মন্দ পথ্য বলতে বুঝি সেই পথ্য যাতে অপরিহার্য পুষ্টি উপাদান ও শক্তির উৎস খাবারগুলির অভাব রয়েছে।

সাধারণভাবে যারা পর্যাপ্ত পরিমাণে খেতে পায় না, তারাই মন্দ পথ্যের শিকার। তাছাড়া যে পথ্যে নানা ধরনের খাদ্যসামগ্রী নেই ও যে পথ্য সুষম নয় তাকে মন্দ পথ্য বলে। মন্দ পথ্য এমন পথ্যকেও বলে যাতে অতিরিক্ত খাদ্য শক্তি রয়েছে অথচ পুষ্টি উপাদান কম রয়েছে। সাধারণভাবে অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে অতি পুষ্টির সমস্যা দেখা দেয়। তাছাড়া পথ্যে সব খাবারের শক্তির মাত্রা বেশি রয়েছে তেমন খাবার খেলে এবং সঙ্গে যদি শারীরিক পরিশ্রম কম হয় তখন অতি পুষ্টির সমস্যা দেখা যায়।

অতি পুষ্টির (খাদ্য শক্তির নিরিখে) সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে কিছু অপরিহার্য পুষ্টি উপাদানের অভাব (যেমন আয়রন ও ভিটামিন), বোঝা যাচ্ছে, অপুষ্টির দুটি প্রধান ধরণ : ১) অতিপুষ্টি ২) স্বল্প-পুষ্টি। উন্নয়নশীল এবং উন্নত দেশগুলিতে এই দুই ধরনের পুষ্টিগত সমস্যা দেখা যায়। উন্নত দেশগুলিতে অতি পুষ্টি ও স্থূলতাজনিত রোগ তীব্র গতিতে বেড়ে চলেছে। আর উন্নয়নশীল দেশগুলিতে স্বল্প পুষ্টি সমস্যার প্রধান কারণ, যার ফলে খাদ্য শক্তি ও অপরিহার্য পুষ্টি উপাদানের অভাব ঘটে।

নাম তালিকা

অপুষ্টি বলতে আমরা যে সব শব্দ ব্যবহার করি

- ✓ অপুষ্টি : একটি সাধারণ শব্দ যার মধ্যে রয়েছে নানান স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যার কথা। এই সমস্যার মূল কারণ অ-পর্যাপ্ত মাত্রায় অথবা অতি মাত্রায় পুষ্টি উপাদান ও খাদ্য শক্তি গ্রহণ করা। এর দুটি ভাগ অতিপুষ্টি এবং স্বল্পপুষ্টি।
- ✓ ক্ষুধা : খাবারের অভাবে যে শারীরিক ও মানসিক অ-সুবিধা তৈরি হয় তাকে ক্ষুধা শব্দটি দিয়ে বোঝানো হয়। কখনো কখনো একটা সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর মোট খাদ্য গ্রহণের অপরি্যাপ্ত অবস্থা বোঝাতে গিয়ে এই ক্ষুধা শব্দটি ব্যবহার করা হয়।
- ✓ স্বল্পপুষ্টি : পুষ্টি উপাদান ও খাদ্য শক্তির অভাবের দরুণ এই অবস্থার সৃষ্টি হয়।

কোন পুষ্টি উপাদানের অভাব ঘটছে তার উপর নির্ভর করে স্বল্প-পুষ্টি সমস্যা। এই সমস্যা নানান প্রকারের হয়। স্বাস্থ্যকর পথ্য না খেলে কী হয়? অস্বাস্থ্যকর পথ্যের প্রভাব শুধুমাত্র শরীরে পড়ে না, এর একটি মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবও তৈরি হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে অপরি্যাপ্ত পথ্য গ্রহণের ফলে তাদের বৃদ্ধি বন্ধ হবে বা মাত্রা কমে যাবে, শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে ও বুদ্ধি বিকাশ বাধা পাবে। স্কুলে যাওয়া বাচ্চাদের পুষ্টির অভাবের ফলে মনোসংযোগের সমস্যা হয় এবং তারা সুপুষ্টি বাচ্চাদের তুলনায় কম শিখতে পারে। বড় ছেলেমেয়ে ও প্রাপ্তবয়স্কদের শরীরের উপর অপুষ্টি কুপ্রভাব ফেলে। মন্দ পথ্যের ফলে কার্য ক্ষমতা কমে যায়, রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ে।

রোগাক্রান্ত হওয়া মানে কেবলমাত্র শারীরিক ও মানসিক কষ্ট, যন্ত্রণা ভোগ করা নয়। এর সাথে যুক্ত হয় বারবার চিকিৎসা কেন্দ্রে যাওয়া, যার ফলে কাজের সময় ও অর্থ নাশ হয়। অপরিাপ্ত পথ্যের প্রভাব আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উপর গিয়ে পড়ে। এর ফলে দেশের অবস্থার অবনতি হয়।

কয়েক ধরনের অপুষ্টিজনিত সমস্যা হলোঃ

- ✓ প্রোটিন ও খাদ্য শক্তির অভাব
- ✓ স্বল্প সময়ের জন্য ক্ষুধা
- ✓ আয়রনের অভাবে অ্যানিমিয়া
- ✓ ভিটামিন এ -র অভাব
- ✓ আয়োডিনের অভাব
- ✓ ভিটামিন বি- র অভাব
- ✓ ওজন বৃদ্ধি
- ✓ অল্পে পরজীবি (জীবাণু)
- ✓ খাওয়া সংক্রান্ত সমস্যা; অ্যানোরেক্সিয়া, বুলিমিয়া

এছাড়াও আমরা জানি যে, অপুষ্টি শুধুমাত্র শারীরিক প্রভাব ফেলে না, পড়া-শেখার আচরণেও ব্যাঘাত ঘটায়। মস্তিষ্কের কার্য ক্ষমতায় সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে যার ফলে অসুখ করতে পারে। অপুষ্টির কারণে শিশুরা সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, অমনোযোগী ও বদমেজাজী হয়ে ওঠে।

স্কুল চলাকালীন যে ক্ষুধা তৈরী হয়, যাকে আমরা স্বল্প সময়ের ক্ষুধা বলি তাতেও মনোসংযোগে ব্যাঘাত ঘটে, শেখার ক্ষমতা কমে যায়। এই ভাবে শিশুদের স্বাস্থ্য অবস্থা তাদের শিক্ষায় প্রভাব ফেলে। ক্ষুধার্ত শিশুর শিখতে সমস্যা হয়।

কার্যবিধি ২ : অপুষ্টির প্রভাব

অপুষ্টি শেখার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে

লক্ষণ চিনতে পারাঃ

“এই শিশুটির শরীরে আয়োডিনের অভাব রয়েছে” – এটা নির্ধারণ করা শিক্ষকের কাজ না। এটা স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর ছেড়ে দিতে হবে। তবু কোন শিশুর সাহায্য দরকার বা কার শরীরে অপুষ্টির প্রাথমিক লক্ষণগুলো উঁকি দিচ্ছে সেগুলো বুঝে ফেলার ভূমিকা স্কুল নিতে পারে। ক্লাস ঘরে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহার,

আচার-আচরণ তাদের পুষ্টি সংক্রান্ত অবস্থা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানায়।

কার্যবিধি ৩ : লক্ষণ চিহ্নিত করা

প্রথমেই জেনে নিতে হবে যে, অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের দেখে আপাতভাবে তাদের অপুষ্টির অবস্থান বোঝা যায় না। বিশদ সন্ধেতগুলো অনেক ক্ষেত্রেই খুবই সূক্ষ্ম। মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টের অভাবের দরুণ কোনও শারীরিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না, যদি না দীর্ঘ সময় ধরে ভীষণমাত্রায় নিউট্রিয়েন্টের অভাব ঘটে থাকে। খাদ্য শক্তি ও প্রোটিনের অভাবে শিশুদের ওজন স্বাভাবিকের থেকে কম হলেও তা সব সময় নজরে পড়ে না। যদি না কম ওজন বেশ ভয়ানক রকমের কম না হয়। আমরা এদেরকে ছিপছিপে শরীরের বলে মনে করতেই পারি। অনেক বাচ্চাই, যারা দীর্ঘ সময় ধরে অপুষ্টিতে ভুগছে, তাদেরকে দেখে কখনোই কঙ্কালসার শরীর মনে হবে না। অথচ বাস্তবে তাদের হয়তো বয়সের তুলনায় বাড়-বৃদ্ধি কম। একমাত্র যদি আমরা তাকে তার বয়সী সু-পুষ্ট শিশুর সঙ্গে তুলনা করি তখনই অভাবটি বুঝতে পারব। সাধারণভাবে শিক্ষকেরা যে লক্ষণগুলি চিহ্নিত করতে পারবেন সেগুলি হলো :- ক্লান্ত, দুর্বল, অস্থির, বদমেজাজ, ক্লাসে বারংবার অনুপস্থিতি, মনোসংযোগ ও মনোনিবেশের অভাব। যেহেতু উপরোক্ত আচরণগুলির জন্য ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীরা শান্তি পায়, তাই এই সব আচরণ দেখে শিক্ষকেরা যেন শিশুর শারীরিক সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন থাকেন। ছাত্র-ছাত্রীদের আরচণে বিরক্ত না হয়ে বরং ওই ছাত্র-ছাত্রীদের বিষয়ে যেন তাঁরা একটু ভাবনাচিন্তা করেন। অপুষ্টির জন্য কোনও শিশু যদি শান্তি পায়, তবে সেটা বেশ দুঃখের! সেক্ষেত্রে শিশুর প্রতি শিক্ষকের এই আচরণ বিফলে যাবে।

বাচ্চাটা কী সত্যিই অমনোযোগী না কি অপুষ্টিতে ভুগছে?



অপুষ্টি চিহ্নিত করা বেশ কঠিন। কারণ ভয়ানক অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশু হয়তো স্কুলেই আসতে পারে না, সে ভীষণ দুর্বল বা অসুস্থ। যারা অল্প মাত্রায় অপুষ্টিতে ভুগছে এবং তার লক্ষণ শরীরে দেখা দিচ্ছে তাদের

দিকে নজর দিলে দেখা যাবে:

শেখার আচরণে:

- ✓ মনোযোগের অভাব
- ✓ দুর্বল স্মৃতিশক্তি
- ✓ বোঝার অসুবিধা
- ✓ বাড়ির কাজ করতে চায় না
- ✓ ক্লাসে কাজ করতে গিয়ে পিছিয়ে পড়ে

অন্যান্য আচরণে:

- ✓ বারবার অনুপস্থিত
- ✓ লাজুক, মিশতে পারে না
- ✓ অস্থির
- ✓ বদমেজাজি

সম্ভাব্য সমস্যাগুলো বুঝে উঠতে পারলে, শিক্ষক মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করতে পারেন। শিশুর জীবনে বাবা-মা বা স্বাস্থ্যকর্মী ছাড়াও অন্যান্য যারা যুক্ত থাকবে শিক্ষকেরা এই সমস্যা তাদের সম্বন্ধে সচেতন করতে পারেন। শিশুকেও এই ব্যাপারে সচেতন করে তুলতে পারেন।

স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অপুষ্টির সমস্যা থাকলে সে ব্যাপারে শিক্ষক, শিক্ষিকাদের এই ব্যাপারে সচেতন করে তোলার জন্য স্কুল প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে পারে।

বিপদ সঙ্কেত সম্বন্ধে শিক্ষকদের সংবেদনশীল হওয়া উচিত

অবস্থা	লক্ষণ	পড়া-শেখার প্রভাব
প্রোটিন-শক্তির অপুষ্টি : প্রোটিন ও খাদ্য শক্তির অভাব ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের অভাব	অল্পমাত্রায় অভাব বলে ওজন ও উচ্চতা বাড়ে না। বেশি মাত্রায় কম হলে : পেশি দুর্বলতার রোগ, সঙ্গে নানা ধরনের লক্ষণ যেমন : ফোলা পেট, লাল চুল, চুল ওঠা, অ্যামোনিয়া, চামড়ায় ছোপ দাগ দেখা দেয়। সংক্রমক রোগের জন্য এই অপুষ্টির প্রাদুর্ভাব বাড়ে	অল্পমাত্রায় অপুষ্টির ফলে ক্লাস্তিভাব, মনোযোগের অভাব, স্মৃতিশক্তি কম হওয়া, অস্থিরতা, বদমেজাজ, বৃদ্ধির অভাব, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুক্ষ্ম সংগলন দক্ষতার অভাব, অতি সংক্রমণের প্রবণতা, বারবার রোগাক্রান্ত হওয়া, স্কুলে ভালো ফল না করা, স্কুলে অনুপস্থিতির হার বেশি

স্বল্পস্থায়ী ক্ষুধার অনেকক্ষণ ধরে না খেয়ে থাকা	কোন কিছু বোঝা যায় না	অশান্ত, অল্পতেই বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, মনোযোগের অভাব
অ্যামোনিয়া (আয়রণের অভাব)	চোখে, নখে গ্লান ভাব	ক্লান্তি, শ্বাসকষ্ট, শেখার অসুবিধে, রোগাক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা
ভিটামিন এর অভাব	রাত কানা রোগ, অক্ষত্ব	চোখে কম দেখা, অসুস্থ বোধ করার ফলে বারবার স্কুলে অনুপস্থিতি
আয়োডিনের অভাব	থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের সমস্যা, শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি বাধা পায়	শেখার প্রতিবন্ধকতা, কথা বলার সমস্যা, সুস্থ ভাবে মানসিক প্রতিবন্ধকতা
ভিটামিন বি'র অভাব	পেশি দুর্বলতা, স্নায়ু দুর্বলতা, হজম সমস্যা, ত্বকের সমস্যা, প্রবল অ্যামোনিয়া হার্ট সমস্যা, মানসিক বৈকল্য	পেশি সঞ্চালন সমস্যা, পায়ে ব্যাথা, শেখার প্রতিবন্ধকতা, অনুপস্থিতির হার বেশি হয়
অতিপুষ্টি : প্রয়োজনের থেকে বেশি খাদ্য শক্তি গ্রহণ করা	অতিরিক্ত চর্বিওয়ালা শরীর, রক্তচাপ বৃদ্ধি, স্থূলতা	শারীরিক কাজকর্মে অনীহা। কাজ করতে কষ্ট হয়।
পরজীবী : কৃমি	ডায়রিয়া, শরীর থেকে জল বেরিয়ে যায়, বৃদ্ধিতে বাধা, পুষ্টি বেরিয়ে যায়	ক্লান্তি, দুর্বলতা, স্কুলে অনুপস্থিতি
অ্যানোরেক্সিয়া : ভীষণ অল্প খাওয়া	উল্লেখযোগ্য ভাবে ওজন কমে যায়	মানসিক অবসাদ, সামাজিক ব্যবহারে নিষ্ক্রিয়তা, আত্মমর্যাদার অভাব
বুলিমিয়া : বেশি খেয়ে ফেলা তারপরই স্বেচ্ছায় বমি করা	উল্লেখযোগ্য ভাবে ওজন কম হওয়া	মানসিক অবসাদ, আত্মমর্যাদার অভাব, সামাজিক আচরণে নিষ্ক্রিয়তা

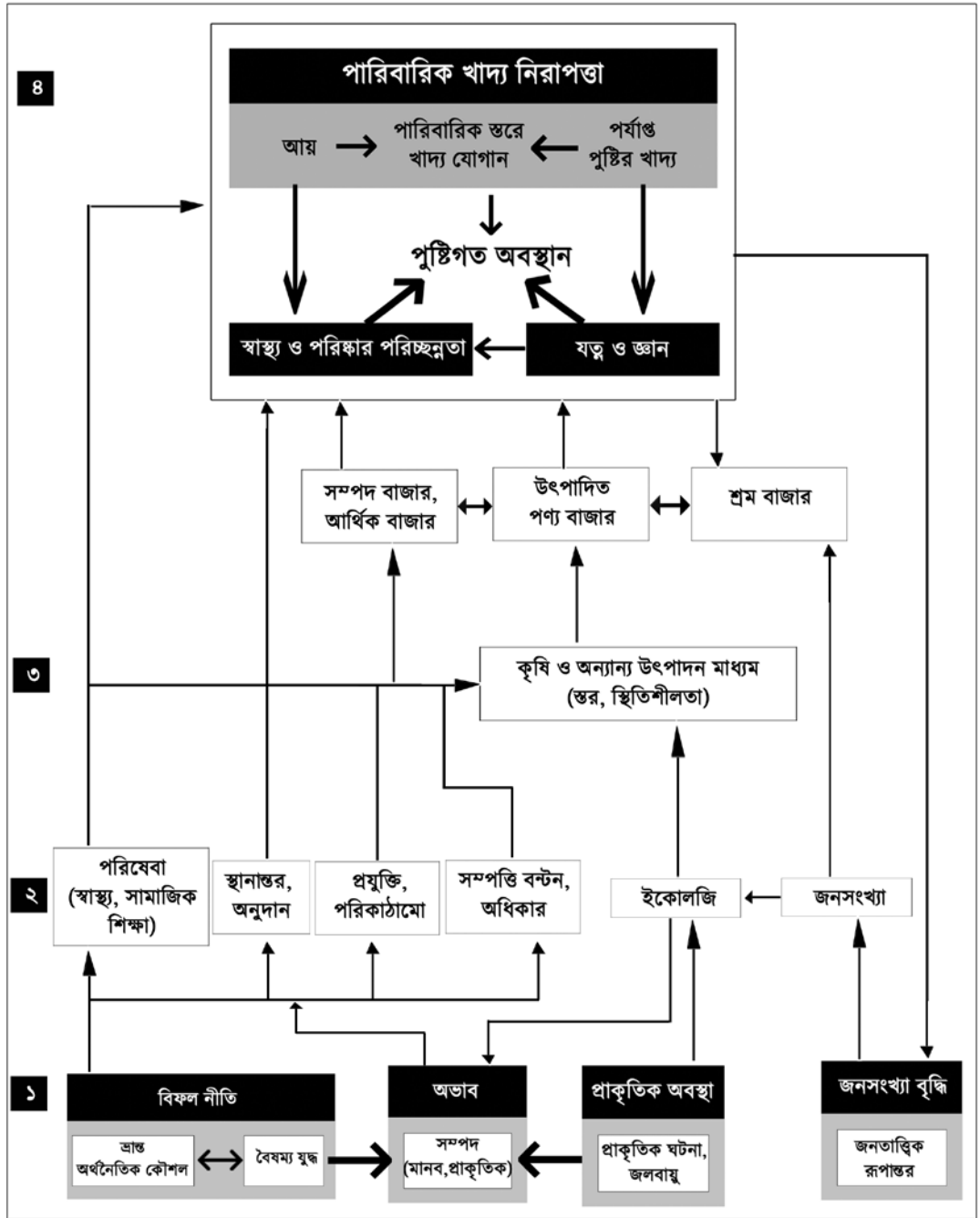
কার্যবিধি ৪ : অপুষ্টির কারণ

অপুষ্টির কারণ, অত্যন্ত সাধারণ কারণে অপুষ্টি ঘটে। তাছাড়া অপুষ্টি কেন হয়, তার পিছনে কারণগুলো অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়। যেমনঃ

- ✓ কম পরিমাণ খাওয়া বা খুব বেশি খাওয়া
- ✓ সুস্থম আহার না করা। এমন খাদ্য খাওয়া যার মধ্যে অতিপ্রয়োজনীয় পুষ্টিগুলির অভাব থাকে।

কিন্তু সেই মূহুর্তে আমরা জানতে চেষ্টা করি যে মানুষ পর্যাপ্ত পরিমাণে খায় না, বা কেন সঠিক ধরণের খাবার খায় না, ব্যাপারটা অনেক জটিল ঠেকে। অপুষ্টির পিছনে খাদ্য ছাড়াও অন্য নানান কারণ থাকে। তাছাড়াও ব্যক্তি বিশেষ বা পরিবারের আয়ত্তের বাইরের কিছু ঘটনাও অপুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন ধরুন : জাতীয় উন্নয়ন নীতি, ম্যাক্রোইকোনমি ও কৃষি নীতি। নিম্নোক্ত ছবিতে অপুষ্টির নানান কারণ ও তাদের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক কীভাবে এক জন ব্যক্তির পুষ্টিকে প্রভাবিত করে, তা দেখানো হয়েছেঃ

দ্রষ্টব্য : ১ : মৌলিক কারণ ২ : পরিকাঠামো। প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান, কাজের এলাকা ৩) বাজারের পরিস্থিতি



৪) অতি-ক্ষুদ্র স্তরে প্রভাব (পরিবার, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে, লিঙ্গ)

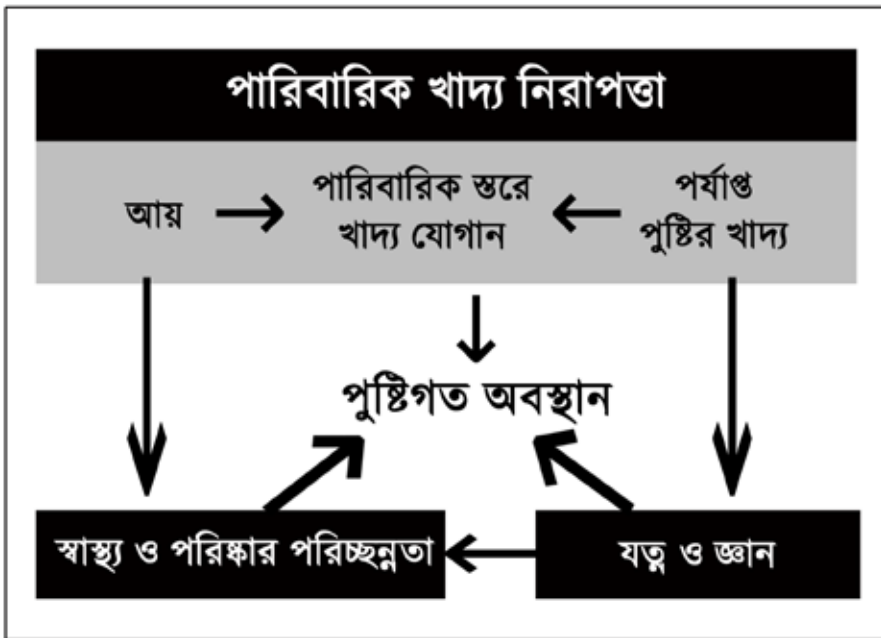
বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অপুষ্টির কারণের সঙ্গে দারিদ্রতা জড়িয়ে থাকে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে। দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষেরা প্রাথমিক ভাবে অপুষ্টির শিকার হন। এঁরা না পায় পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার,

না পায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে বাস করার সুযোগ। পরিশ্রুত জল সরবরাহ ও মৌলিক পরিষেবা থেকেও তাঁরা বঞ্চিত হন। শিক্ষার সুযোগ এবং তথ্য জানার অধিকারও থাকে না।

যে সব বিষয় পুষ্টিগত অবস্থানকে সরাসরি প্রভাবিত করে সেগুলি হলোঃ

- ✓ পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা
- ✓ স্বাস্থ্য
- ✓ জ্ঞান ও যত্ন

নিচের ছবিতে এই তিনটি উপাদানের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক দেখানো হয়েছে
পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা



পুষ্টিগত ভালো থাকার প্রধান স্তম্ভ হলো পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যের প্রাপ্তি। তবে নিঃসন্দেহে যে খাবার পাওয়া যাবে তার পুষ্টিগুণ থাকতে হবে এবং তা হবে নিরাপদ ও স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মানান সই। মানুষের কাছে এই খাদ্যের যোগান থাকবে। এই খাবার তারা উৎপাদন করবে বা কিনে আনবে। এই গোটা প্রক্রিয়াটি মিলে গিয়ে পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা তৈরি হয়। পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা বলতে আমরা বুঝি ‘এমন একটা প্রক্রিয়া যার সাহায্যে প্রতিনিয়ত প্রত্যেকটি মানুষ সেই খাদ্য গ্রহণ করতে পারে; যার সাহায্যে সক্রিয় ও স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করা সম্ভব হয়। ১৯৯২ সালে FAO এবং WHO-র প্রণীত সংজ্ঞা অনুযায়ী একেই খাদ্য নিরাপত্তা বলা হয়।

স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার - পরিচ্ছন্নতা

ডায়রিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাস ম্যালেরিয়া, অস্ত্রে পরজীবি - এই ডিসপ্রুভুতি শরীরের পুষ্টিগত অবস্থানকে অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে এই বাড়ে। সংক্রমণে আক্রান্ত থাকে, ফলে সে কম আগে থেকে অপুষ্টির



সংক্রান্ত রোগ, হাম, সংক্রমণ, এইচ আই ভি সংক্রমণাত্মক অসুখগুলো প্রভাবিত করে। অপরিষ্কার-সংক্রমণগুলির ঝুঁকি আরো ব্যক্তির খাওয়ার রুচি কম পরিমাণ খাবার খায়। যারা শিকার তাদের ক্ষেত্রে এই

দশা তাদের শরীরকে আরো দুর্বল করে দেয়। কারণ তাদের শরীরে এমনিতেই জমানো রসদের অভাব কম থাকে, সেটা রোগের ফলে আরো কমে যায়। এদিকে সংক্রমণের কারণে পুষ্টি উপাদানের চাহিদা বেড়ে যায়। বিশেষ করে প্রোটিনের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কারণ প্রোটিনের সাহায্য নিয়ে শরীর তার রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা চালু রাখে। ডায়রিয়া হলে শরীর থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান বেরিয়ে যায় (যা খাওয়া হচ্ছে তার অর্ধেক)।

এইভাবে অপুষ্টি আর সংক্রমণের একটি দূষিত চক্র তৈরি হয়। সংক্রমণ অপুষ্টিকে বাড়ায় আর অপুষ্টির ফলে সংক্রমণ বাড়ে। অপুষ্টির মোকাবিলা করার অর্থ কিছু স্থানীয় রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়া।

আর এটা করতে হলে অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে কাজ করতে হবে। কারণ এই অস্বাস্থ্যতার কারণেই সংক্রমণ ঘটে।

জ্ঞান ও যত্নঃ

একটি পরিবারে পর্যাপ্ত রোজগার সত্ত্বেও পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা বা পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বাস করা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করার পরেও অপুষ্টি দেখা দিতে পারে। একক ভাবে এই উপাদানগুলি পুষ্টির উন্নতিতে কোনও সুপ্রভাব রাখতে পারে না, যদি না সেই পরিবার উপরোক্ত উপাদানগুলি সদ্ব্যবহার করতে না জানে। তার কারণ ওই পরিবারের প্রয়োজন উপযুক্ত জ্ঞান ও যত্ন নেওয়ার দক্ষতা, যার সাহায্যে পরিবারের সংকট - প্রবণ সদস্যদের খেয়াল রাখতে পারে।

যত্ন প্রক্রিয়াটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় সময়, খেয়াল রাখা, সহযোগিতার মতো কয়েকটি গুণ। বাড়ন্ত শিশু ও পরিবারের সদস্যদের ব্যক্তিগত শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক চাহিদা পূরণ করতে পরিবার ও সমাজকেই একটু সময় দিতে হবে, খেয়াল রাখতে হবে ও সহযোগিতা করতে হবে।

উন্নয়নশীল দেশের বেশিরভাগ পরিবারে এই যত্ন ও পরিচর্যার বিষয়টি সাধারণভাবে মা বা কন্যাদের দায়িত্বে থাকে। পরিবারের বাবা সাধারণভাবে এসবের খেয়াল করেন না। পুষ্টি সংক্রান্ত যত্ন নেওয়ার অর্থঃ

- ✓ পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন পুষ্টি সংক্রান্ত চাহিদা বোঝা
- ✓ কোন খাবার তৈরি করা হবে ও খেতে দেওয়া হবে সে ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারা
- ✓ কতটা পরিমাণ খাবার তৈরি করা হবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারা



এছাড়াও যিনি পারিবারিক যত্নের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন, তিনি যেন শিশু লালন পালন, রান্না করা ও শিশুকে খাওয়ানোর জন্য সময় দিতে পারেন। উন্নয়নশীল দেশে মহিলারাই পারিবারিক খাদ্যসামগ্রী উৎপাদন করেন, আবার পরিবারে যত্নআত্তির কাজও করেন। তাছাড়াও তাদের জল আনতে যেতে হয়। জ্বালানি জোগাড় করা, খাবার সামগ্রী মজুত করা, খাদ্য প্রক্রিয়া করা ও বিক্রি করার মতো কাজগুলিও মেয়েরাই করে থাকেন।

চাষের কাজ যখন তুঙ্গে থাকে তখন মেয়েদের সারাদিনই কাজ করতে হয়। সেই সময় শিশুদের ঠিকঠাক যত্ন করা, সঠিক খাবার দেওয়া এবং বারে বারে খাওয়ানো যথাযথ ভাবে করা হয়ে ওঠে না। জ্ঞানগম্যি বা পুষ্টি সংক্রান্ত ধারণাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর সঙ্গে সামাজিক অবস্থান ও আচার ব্যবহারের একটা সম্পর্ক রয়েছে। কিছু উৎকৃষ্ট খাদ্য সামগ্রীর সামাজিক মান কম। তার ফলে সেই সব উপযুক্ত খাবার স্থানীয় ভাবে পাওয়া গেলেও সেগুলির সদব্যবহার করা হয় না। খাবারের বৈচিত্র্য ও সুস্বাদু পথ্য সম্বন্ধে কোনও ধারণা নাও থাকতে পারে। অনেক সময় বাবা মায়েরা মনে করেন যে, তাঁদের ছেলেমেয়েরা যেহেতু পেট ভরে খেতে পাচ্ছে তাই তাঁরা সঠিক খাবারই খাওয়াচ্ছেন। এমনও হতে পারে তাঁদের সন্তান যে খাদ্য খায় তার কোনও পৌষ্টিক মূল্য নেই এবং খাবারে হয়ত অপরিহার্য পুষ্টি উপাদানগুলি অনুপস্থিত। এছাড়াও সম্পদের অভাবে বন্টনে সমস্যা দেখা দেয়। ফলে অভাবের সংসারে মহিলা ও শিশুদের ভাগে সবশেষে ও সবচেয়ে কম পরিমাণ খাবার জোটে। এই প্রথাটিতে সামাজিক অনুমোদন থাকে।

পুষ্টি নিরাপত্তা – পরিবারের সু-পুষ্টির চাবিকাঠি

দেখা যাচ্ছে খাদ্য নিরাপত্তা অর্থাৎ খাবার সামগ্রী পাওয়া ও গ্রহণ করাই শেষ কথা নয়। খাদ্য নিরাপত্তার ফলে একটি পরিবারের সু-পুষ্টিগত অবস্থান তখনই নিশ্চিত হয় যখন পরিবারের সদস্যদের পুষ্টি নিরাপত্তা থাকে। এর অর্থ :

- ✓ পুষ্টিগত ভাবে যথার্থ ও নিরাপদ খাবার গ্রহণ করা।
- ✓ যথোপযুক্ত যত্ন, অর্থাৎ একটি পুষ্টিগত পথ্য জোগাড় করতে, তৈরি করতে এবং খাওয়ার জন্য উপযুক্ত জ্ঞান, দক্ষতা ও সময় থাকা দরকার। এগুলোর সাহায্যে ছোট শিশুদের বিশেষ চাহিদাগুলোও পূরণ করা সম্ভব হয়।
- ✓ স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করার সুযোগ ও একটি স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশে বসবাস।

অপুষ্টির অনেক কারণ

অপুষ্টির সঙ্গে মোকাবিলা করার নানান উপায়ঃ

১। গোষ্ঠীগত ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ

আদর্শগত ভাবে অপুষ্টির বিরুদ্ধে লড়াইতে গেলে এক সাথে সব স্তরে, সব জায়গায় (জাতীয়, গোষ্ঠী ও পরিবার) উদ্যোগ নেওয়া দরকার। যেহেতু অপুষ্টির অনেক কারণ সাধারণ মানুষের আওতার বাইরে থাকে তাই অনেক সময় মানুষের মনে হতাশা তৈরি হয়। অপুষ্টির কারণ হিসাবে এমন কয়েকটি উপাদান রয়েছে, যেগুলিকে মোকাবিলা করার ক্ষমতা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর থাকে। এমন কিছু ক্ষেত্রে কাজ করা যেতে পারে যেগুলি সরাসরি পুষ্টি নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত, যেমন পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি সংক্রান্ত জ্ঞান ও যত্ন পরিচর্যা।

পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তাঃ

- ✓ কৃষিপ্রধান গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রথমেই দরকার পরিবার পিছু খাদ্যগ্রহণ ও বিক্রি করার জন্য ফসল উৎপাদন মাত্রায় বৃদ্ধি ও নানা ধরণের খাদ্যবস্তুর উৎপাদন। এরফলে পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তায় উন্নতি ঘটবে। আরো কয়েকটি উপাদান প্রয়োজন যেমন পর্যাপ্ত পরিমাণ জল, ঋণ দান, মজুত করার সুব্যবস্থা।
- ✓ একটা পরিবারকে সারা বছর যথেষ্ট খাবার পেতে হলে প্রয়োজন ভালো ঘরবাড়ি, গোষ্ঠীবদ্ধ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা, খাদ্য সংরক্ষণ ও মজুত করার ব্যবস্থা। কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণের মতো ক্ষুদ্র শিল্পগুলি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে ও রোজগারের সুযোগ এনে দেবে।
- ✓ রোগ প্রতিরোধে ও শিশুদের বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে প্রয়োজন নিরাপদ খাবার যা নিশ্চিত হয় স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে খাবার রান্না করা আর পরিচ্ছন্ন পরিবেশনের মাধ্যমে।

স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

- ✓ অপুষ্টি – সংক্রমণের দূষিত আবর্ত ভেঙ্গে ফেলার জন্য প্রয়োজন উন্নতমানের পরিবেশগত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, যা সম্ভব হয় সংক্রমিত জলের সমস্যা সমাধান করে, মলমূত্র ও পরিবারের আবর্জনার স্বাস্থ্যকর উপায়ে নিকাশনের ব্যবস্থা করে।
- ✓ স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়াটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, সেখানে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করলেই পুষ্টি মাত্রা বৃদ্ধি পায়। রোগ প্রতিরোধ, টিকা, চিকিৎসা, শিশু জন্মানোর পর পরিষেবা, oral rehydration, স্তন দানে উৎসাহিত করা, যথার্থ ভাবে ও ঠিক সময়ে মাপের দুধ থেকে বাচ্চাকে সরিয়ে এনে পরিপূরক খাদ্যাভাস তৈরি করা, অসুস্থ শিশুদের

খাওয়ানো, পুষ্টি শিক্ষা প্রভৃতির সাহায্যে স্বল্প-পুষ্টির সমস্যাকে মোকাবিলা করা যায়।

জ্ঞান ও যত্নঃ

✓ পরিবারের সংকটপ্রবণ সদস্যদের যত্ন নিতে পরিবারের মধ্যে যেভাবে সাহায্য করা যেতে পারে, যেমন মেয়েদের কাজের ভার ও সময় কমানোর জন্য যথোপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে (যেমন, সহজে জল পাওয়া যাবে এমন ব্যবস্থা) ,মেয়েদের আয় বৃদ্ধি হবে এমন সুযোগ সুবিধের ব্যবস্থা করা। এর ফলে কাজ কমলে, সময় বাড়লে, আয় বাড়লে মেয়েরা নিজেদের ও পরিবারের আরো খেয়াল রাখতে পারবে।

✓ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সমাজে মেয়েদের অবস্থানে উন্নতি আনা সম্ভব। জমি ও অন্যান্য উৎপাদিত সম্পদের উপর মেয়েদের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

✓ পুষ্টি ও সু-স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সুশিক্ষা থেকে সবারই উপকার হয়। এছাড়া ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করে গোষ্ঠীকেও শিশুদের যত্ন-পরিচর্যার কাজে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া যায়। বাবাদেরকেও সক্রিয়ভাবে শিশু যত্নের কাজে নিয়োগ করা যায়।

২। শিক্ষা ও স্কুলের ভূমিকা

শিক্ষার ভূমিকা



শিক্ষা আর স্বাস্থ্যের মধ্যে একটা দ্বিমুখী সম্পর্ক রয়েছে। শিশুর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য অবস্থা তার শেখার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। আবার শেখা জানা শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টিগত অবস্থানকে প্রভাবিত করে। শিক্ষা দারিদ্রকে

তাৎক্ষণিক ভাবে প্রতিরোধ করতে না পারলেও তার সুদূর প্রসারী প্রভাব অবশ্যই আছে। যেমন:

- ✓ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত আচরণে সরাসরি প্রভাব ফেলে
- ✓ সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলে
- ✓ কীভাবে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উৎপাদন করা যায় এবং তা সংরক্ষণ করা যায়, সে বিষয়ে নতুন নতুন ধারণা দেয়
- ✓ স্থানীয় রোগ, সংক্রমণ কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন উপায় জানা যায়
- ✓ খাওয়া ও খাদ্যাভাস সম্বন্ধে অজ্ঞানতা দূর করে স্বাস্থ্যকর খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে উৎসাহ বাড়ায়। এখন দেখা যায় যে একটা ক্লাসরুমে প্রচুর ছাত্রছাত্রী রয়েছে এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর অপুষ্টিজনিত সমস্যা রয়েছে। কেউ কেউ অপুষ্টিজনিত রোগেও ভুগছে। আর শিক্ষক শিক্ষিকারা তা না জেনেই তাদের সু পথ্য বিষয়ে পড়ান। বাস্তবে সত্যি সত্যিই এমন ঘটনাই ঘটে চলেছে। শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির সমস্যা রয়েছে বুঝতে পারলে স্কুলের পক্ষ থেকে কয়েকটি তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়া উচিতঃ

১. অপুষ্টিজনিত সমস্যার বিপদ সম্বন্ধে শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের সচেতন করে তোলা
২. স্বাস্থ্য পরিষেবার সাহায্য নেওয়া
৩. সমস্যা মোকাবিলায় পরিবার ও গোষ্ঠীর সাহায্য নেওয়া

**'এই সচেতন পরিমন্ডলে পুষ্টি শিক্ষা সবচেয়ে ভালো ফল দেবে'
উপসংহারঃ যা জানলাম**

- ✓ অপুষ্টির কারণগুলি জটিল ও সম্পর্কযুক্ত। তেমনই সমাধানগুলি : জটিল ও সম্পর্কিত
- ✓ লড়াইয়ের সবচেয়ে প্রথম সারিতে রয়েছে শিক্ষা। এই শিক্ষা ছড়াতে হবে বাবা-মা, শিক্ষক/ শিক্ষিকা, স্কুল কর্মী, সরকার, কর্মীবৃন্দ, মন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ে, এবং যারা স্কুল পাঠক্রম তৈরি করে তাদের মধ্যে
- ✓ সবাই ভালো খাবে সুস্থ থাকবে। সবাই চায় সুস্থ ও সবল সন্তান
- ✓ এতক্ষণ ধরে যা বলা হলো তার সবকটি স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাস সংক্রান্ত শিক্ষার স্বপক্ষে অনুপ্রেরণা জোগায়।

শিক্ষা অপুষ্টিকে প্রতিরোধ করে

‘...মানুষের কাছে যাও
তাদের মধ্যে থাকো
মানুষের কাছ থেকে শেখো
তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করো
মানুষের যা আছে সেটাকেই সমৃদ্ধ করো।
মনে রেখো, ...ভাণ্ডার নেতা সেই
যার কাজ শেষ হয়ে গেলে
মানুষ বলে যে, আমরাই করেছি।’

 **AHEAD Initiative**

৫/১/২/জি কর্নফিল্ড রোড (বালিগঞ্জ), কলিকাতা- ৭০০০১৯
ফোন- ০৩৩ ৪০৬৭ ০৩৬৯/ ইমেল- ahead@aheadinitiatives.in